নৃত্যবিতান

(ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্ণৌ ; প্রয়াগ সংগীত সমিতি, এলাহাবাদ ; প্রাচীন কলাকেন্দ্র, চণ্ডীগড হরিয়ানা ; রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পঃ বঙ্গ ; সুরের মায়া সঙ্গীত সমাজ, পঃ বঙ্গ ; বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ, পঃ বঙ্গ ; অনুমোদিত-যে কোন বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উপযোগী ।)

অনুপশংকর অধিকারী

[অধ্যক্ষ—রিদম অব দি ইষ্ট ; নৃত্য নির্দেশক—"ছন্দম, (প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি ও রবীন্দ্র ভারতীর অনুমোদিত), ভারতীয় নৃত্য কলা মন্দির (রবীন্দ্র ভারতী); চাত্‌রা মহিলা পাঠাগার ও শিল্পাশ্রম,— নৃত্য বিভাগ (সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং অনুমোদিত) ; প্রাক্তন শিক্ষক—বাসন্তী বিদ্যাবীথি, কলিকাতা-৫]

বিচারক—আন্তঃ মহাবিদ্যালয়ের নৃত্য প্রতিযোগীতা

পরিক্ষক :—প্রাচীন কলা কেন্দ্র, চণ্ডীগড় । সুরের মায়া সঙ্গীত সমাজ কলিকাতা ।

পরিবেশক

মেসার্স এস কে চন্দ্র এণ্ড কোং

৪নং রফি আহমেদ কিদ্‌ওয়াই রোড,

কলিকাতা-১৩

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি মন্দিরা চক্রবর্ত্তী
৯/৩, Ramanath Majumdar St, Cal-9

দ্বিতীয় সংস্করণ
নবরূপে নবসাজে সজ্জিত।
১১ই ডিসেম্বর ১৯৬০ ইং

প্রাপ্তিস্থান
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলি-৭০০০৭৩

২। "রিদম্ অব দি ইষ্ট"
স্নভাষ পল্লী
মধ্যমগ্রাম
২৪ পরগণা

৩। ৪৬/এ বোসপাড়া লেন
কলিকাতা-৩

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রা :
শ্রীকমলকান্ত দে
৫-এ বৃন্দাবন বোস লেন, কলিকাতা-৬ ও মানিক মুখার্জী

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-বাণিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

যাঁদের স্বর্গীয় স্নেহ সুষমায় আমার জীবন ধন্য হয়েছে সেই পরমারাধ্য পিতৃ-মাতৃ চরণে উৎসর্গীকৃত হল আমার এই প্রয়াস।

—অনুপ

প্রথম সংস্করণে কে কি বলেছেন—

শ্রীঅনুপশংকর অধিকারীর রচনা নৃত্যবিতান শিক্ষার্থীদের জন্য যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে নৃত্য সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক ও প্রয়োগের দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে কমই লেখা হয়েছে এবং ভারতীয় নৃত্যাদির সমাদরও অপেক্ষাকৃত কম, সুখের বিষয় বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আগ্রহ সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নৃত্য শিক্ষার পৃষ্ঠ পোষকতা করা হয়, যে সব শিক্ষার্থী ও নৃত্য সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তি ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে জানতে চান ও শিখতে চান, তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। লেখক নিজে নৃত্য কলায় অভিজ্ঞ এবং নৃত্যের শিক্ষকতায়ও অভিজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ খানি সমাদৃত হবে, এই আশা করি।

শ্রীঅনুপশঙ্কর অধিকারীর নৃত্য সম্পর্কে লিখিত পুস্তক 'নৃত্য-বিতান,' বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য, ঘরাণার পার্থক্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ কর্ম্মাদির বর্ণনা ও পরিভাষা, রূপসজ্জা, নায়ক-নায়িকা-ভেদ, তাল, মুদ্রা প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও শিক্ষার্থীদের নৃত্য শিক্ষার পক্ষে সহায়ক হইবে। আশা করি গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীদের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীঅনুপশংকর অধিকারী প্রণীত 'নৃত্য-বিতান' গ্রন্থটি আদ্যো-পান্ত নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সংগে পড়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলাম। তিনি প্রথিত যশা নৃত্যশিল্পী ৺ডাঃ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, শ্রীমণি বর্ধন ও শ্রীমণি শংকরের কাছে ভরতনাট্যম্, কথক, মণিপুরী ও লোকনৃত্য শিক্ষালাভ করে নিজেকে ইতিপূর্বে সুমার্জিত ও সুদক্ষ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থটির বোলের সুনির্বাচনে, বিষয় বস্তুর সুচিন্তিত বিন্যাসে ও সহজ বোধ্য ভাষায় প্রকাশে তিনি যে একজন সুনিপুণ লেখক তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। এই গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি যে বহু পরিশ্রম করেছেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

গ্রন্থটি নৃত্য শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী ও শিক্ষকদের পক্ষে সহায়ক হবে, এই আশাই করি।

২য় সংস্করণের কথা

আমার কথা তো প্রথম সংস্করণেই আছে এবারে আর কিছু বলবার না থাকলেও বলতে হচ্ছে যে, ১ম সংস্করণে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং নৃত্যরসিক সমাজে যে অভাবনীয় ভাবে সমাদৃত হয়েছে শুধু সেই প্রয়োজনে।

আমার কথা

আমি লেখক নই, নই সাহিত্যিক—সংগীত বিদ্যার নৃত্যকলার শিক্ষার্থী হিসাবে সারা জীবন লব্ধ জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছি "নৃত্য-বিতানের" পাতায় পাতায়। সংগীত শাস্ত্রের অন্তর্গত নৃত্য বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে বহু নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য জ্ঞানীদের প্রণোদিত পুস্তকে সুপরিপুষ্ট। তাঁদেরই আশীর্বাদে তাঁদের কাছে পাওয়া জ্ঞান নিয়ে আমার এই পুস্তকে এইটুকুই বিশেষত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছি যে আমার প্রণোদিত এই পুস্তক নৃত্য পরীক্ষার্থীরা বা নৃত্য রসিকরা যাতে নৃত্য সম্বন্ধে একেবারেই সব কিছু জানতে পারেন এবং তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। সংগীত সমাজে আমার এই উদ্দেশ্য সাফল্যের সিংহদ্বারে উপনীত হলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁদের কাছ থেকে অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে আমার এই শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাঁদের মধ্যে আমার কৃতি ছাত্রীরা যারা সংগীত প্রভাকর পরীক্ষায় সম্মোত্তীর্ণা, তাদেরই অপরিসীম অনুপ্রেরণা আমায় উৎসাহ দিয়েছে এই বই লেখার পেছনে, তাদের নাম হ'ল সর্বশ্রী বাসন্তী মজুমদার, অঞ্জনা ব্যানার্জি এবং চন্দনা মজুমদার। আদি তালের সংগার জন্য প্রখ্যাত তবলিয়া শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী। আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদ্বয় সর্বশ্রী মনি বর্ধন ও মনিশংকর। পাণ্ডুলিপি লেখায় সহায়তা পেয়েছি বন্ধুবর পুর্ণেন্দুশেখর সিংহ ও আমার স্নেহের ছাত্রী কুমারী শিপ্রা গুহ। বইয়ের নামাকরণে যাঁর ইংগিত আমার প্রয়াসের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে তিনি হলেন, "চতুষ্কোণ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। আরও ধন্যবাদ জানাই সংগীত পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীএস চন্দ্র, মহাশয়কে, যিনি শুধু আমায় কয়েকটি ব্লক দিয়ে সাহায্য করেননি, তাঁর বহু সদুপদেশ আমার প্রচেষ্টাকে আলোকিত করেছে। বন্ধুবর নরেশচন্দ্র দাস ও তাঁর সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্য এই সংগে ধন্যবাদার্হ।

—লেখক

সূচীপত্র

নৃত্যের ইতিবৃত্ত

মানুষের ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার শিল্প কর্মে। মানবীয় মননশীলতার অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় শিল্পের বহুমুখীতায়। মানুষের সৃজনীশক্তির বিকাশের বিভিন্ন ধারাগুলির অন্যতম হইল—সংগীত।

মানুষের মন আনন্দ-পিয়াসী, আনন্দ-সন্ধানী। আজ নয়, পৃথিবীর সৃষ্টির দিনটি হইতে ইহা মানুষের মনের প্রকৃতি, হৃদয়ের ধর্ম। কবেকার সেই স্মরণাতীত কাল হইতেই মানুষের মন উল্লসিত আনন্দিত হইলে তাহার হৃদয় হয়।স্পন্দিত, হিল্লোলিত"—ছন্দিত। হৃদয়ের এই আলোড়ন আপনার মধ্যে গুমরিয়া মরুক ইহা মানুষ চায় না, সে চায় বিশ্বলোকে আপনার আনন্দ, আপনার হৃদয়স্পন্দন আপনার প্রাণের উচ্ছ্বাসকে জাগিয়া দিতে, ইহা মানুষের স্বভাব-ধর্ম এবং ইহার জন্য শুধু মুখের ভাষাই যথেষ্ঠ নয়—প্রয়োজন হয় সুরের, অঙ্গ-বিভঙ্গের। ইহাই সঙ্গীত। সঙ্গীত মানুষের প্রকাশ ও বিকাশ, ইহা শিক্ষা বা সভ্যতার উপর নির্ভরশীল নয় এবং দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইহার ব্যাপ্তি লক্ষ্যণীয়।

আদিম মানুষ তাহাদের মানসিক ভাবাবেগ কতগুলি অর্থহীন শব্দ, মুখভঙ্গী ও দেহভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করিত। চীৎকার, হাতহালি ও অঙ্গসঞ্চালনই ক্রমে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের রূপ লইয়াছে। যে অঙ্গবিক্ষেপণ ও ভাবাবেগ প্রকাশের ভঙ্গীগুলি একদা নানা অসংগতিতে পূর্ণ ছিল; সভ্যতার আলোয় নিজেদের মানসিক চিন্তার সেই সংগতি-বিহীন রূপ দেখিয়া ক্রমে সেইগুলি সুসম্বদ্ধ করার প্রয়াস দেখা দিল। এইভাবে বিশ্বসভ্যতার যেরূপ প্রসার ঘটিতে লাগিল শিল্পের অন্যান্য ধারার সহিত সংগীতের নানা শাখারও ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল।

পৃথিবীর যশস্বী মনীষী ও বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে একমত যে, সৃষ্টির সর্বশেষ অধ্যায়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ প্রথম যেদিন ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করিয়াছে, সেদিন হইতেই জন্ম হইয়াছে সংগীতের।

আদিম যুগের মানুষ যখন সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয় নাই তখন স্বভাবতই আত্মবিশ্বাসের স্বল্পতা হেতু অত্যন্ত আয়োজনের সহিত মানুষ নৃত্যগীতেরও সাহায্য নিত। ধার্মিক এবং সামাজিক —সকলপ্রকার ক্রিয়াকর্মে নৃত্য, গীত ও বাদ্য ছিল অনুষ্ঠানের একটি আবশ্যিক এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রাচীন যুগের ধ্বংস স্তূপ হইতে প্রাপ্ত সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈদিক যুগের পূর্বেও সঙ্গীত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর ভগ্নাবশেষ হইতে সে যুগের বহু বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্যছন্দের সাক্ষরযুক্ত বিভিন্ন মূর্ত্তির ভগ্নাংশ, সীলমোহর, প্রস্তর খোদিত দেয়ালচিত্র প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিস্কার কয়িয়াছেন।

পৌরাণিক কাহিনীর সত্যাসত্য নিরূপন করা যায় না, তবে উহা দ্বারা অনুমান করা যায় ভারতীয় সঙ্গীত তথা নৃত্যকলার ঐতিহ্য কত সুপ্রাচীন এবং ইহাতেই এই সকল কাহিনীর সার্থকতা। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষও ভারতীয় নৃত্যের আয়ুষ্কালের প্রাচীনতাকে সমর্থন করে। এবং নৃত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত হইল—ভাষা সৃষ্টির পূর্বে মানুষের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির উপায় ছিল—নৃত্য।

আদিম মানুষের অঙ্গভঙ্গীগুলি ছিল অমার্জিত অসঙ্গতিপূর্ণ

বৈদিক যুগে যাগ যজ্ঞ সম্পাদন কালে যজ্ঞানলের সম্মুখে সামবেদের মন্ত্র সমূহ সুরের মাধ্যমে পঠিত হ'ত। এই মন্ত্রই সামগান নামে পরিচিত। এর উল্লেখ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মেলে। সেই সব তপোবনের ভক্তিমতী আশ্রম নারীবৃন্দ যজ্ঞানলের চারিপাশে

নৃত্য সহকারে, কখনও করতালি দিয়ে আবার কখনও বংশদণ্ড উন্নত করে নৃত্য করতেন। নৃত্যের ছন্দকে বিধৃত রাখার জন্য অনবদ্য বাদ্য বাজানো হত। কিন্তু কোন বা কি ভংগিমায় তাঁরা নৃত্য করতেন, তা আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে এই থেকে মূল কথা উপলব্ধি করা যায় যে, সংগীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নৃত্য করা হত।

তারপর নৃত্যের গঠনাত্মক দিকের পরিচয় মেলে খৃষ্ট শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। এছাড়াও সে যুগে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ এবং আরও অন্যান্যদের লেখা উৎকৃষ্ট নাটক সমূহে এর নজির পাওয়া যায়। আবার আমরা বিভিন্ন উচ্চাংগ পর্য্যায়ের নৃত্য সমূহের এবং তাদের মুদ্রা সমূহের উল্লেখ পাই। সেগুলির অঙ্গভঙ্গি সমূহ ভরতনাট্যম্ শাস্ত্রের পুরোপুরি নির্দ্দেশানুসারে প্রদর্শিত হত। নন্দীকেশ্বর বা নন্দীভরত ও এই কথার উল্লেখ করে গেছেন। দশম শতকে ধনঞ্জয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল, মার্গ ও দেশী আর জনচিত্ত রঞ্জক লোক নৃত্য। এগুলি পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত "দশরূপক" গ্রন্থে। নৃত্য হল মার্গ শ্রেণীও নৃত্ত হল দেশী। সেকালে নৃত্যে নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল। অতএব নৃত্য কথাটি নাটক সংক্রান্তের কথা। অপর পক্ষে নৃত্ত কথাটি হল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপাদান। নন্দীকেশ্বর নৃত্য এবং নৃত্ত কথা দুইটির সংগা অভিনয় দর্পণে দিয়েছেন—

ভাবাভিনয়-হীনং তু নৃত্ত-মিত্যভিধ্যতে।
রসভাব-বিজ্ঞানাদিযুক্তম্ নৃত্যমিত্যুচ্যতে ॥

নৃত্য ও নৃত্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ বিধৃত আছে। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন প্রকার নৃত্যরত মূর্তি পাথরের গাত্রে, শিলালিপি, সাঁচীস্তুপ অমরাবতী মন্দিরের গাত্রে খোদিত ও বাদ্য যন্ত্রগুলি শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। ইহারা পরবর্ত্তী হল বৈদিক যুগ। বৈদিকোত্তর যুগে রামায়ন

মহাভারত হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ বিশেষভাবে আছে। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট আছে। এই আধ্যাত্মিক মনশ্চেতনাতেই ভারতীয় মানসিকতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে দেবমাহাত্ম্যের ওপর ভিত্তি করে।

কথিত আছে, একদিন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার ভেরী বাজাইলেন—ইহার ফলে সৃষ্টি হইল প্রথম ছন্দ বা তাল, সেই ছন্দে দেবাদিদেব আপনার দেহকে দোলায়িত করিলেন ;—সৃষ্টি হইল নৃত্য। সুন্দরের দেবতা শিব হইলেন নৃত্যরাজ।

দেবাদিদেব মহাদেবকে সংগীতের আদি স্রষ্টা বলা হয়। তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এবং পরে ভরত, রম্ভা, হুহু ও তম্বরু প্রভৃতি এই কলা শিক্ষা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মা সংগীতের আদি গুরু। তিনি মহাদেবকে, মহাদেব সরস্বতীকে, সরস্বতী নারদকে, এবং নারদ ভরতকে নৃত্যশিক্ষা দেন। অতঃপর ভরত আপন শিক্ষাসহায়তায় সমগ্র বিশ্বে তাহা প্রচার করেন। কথিত আছে, ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য ভগবান শঙ্কর উল্লাসে যে বীর রসাত্মক নৃত্য করেন—তাহা "তাণ্ডব" এবং বিজয়ের আনন্দের পার্বতী যে উল্লাসনৃত্য করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে "লাস্য" নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ বিধৃত আছে। কেহ বলেন, মহাদেব-সহচর "তণ্ডু"র নামানুসারে দেবাদিদেব রচিত নৃত্যের নামকরণ হয় "তাণ্ডব নৃত্য"। এই নৃত্যের দ্বারা মহাদেব দৈবলীলা প্রদর্শন করেন—তিনি একদিকে ধ্বংস, অপরদিকে সৃষ্টি, শিব ও রৌদ্র, রক্ষা ও সংহারের প্রতিমূর্তি। আবার মহেশ্বরের প্রেরণায় ও উৎসাহে দেবীপার্বতী নৃত্যশিক্ষা দিলেন উষাকে। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী উষাদেবীকে দেবীপার্বতী যে নৃত্য শিখাইলেন তাহা "লাস্য নৃত্য" বলিয়া পরিচিত—ইহা নারীসুলভ, কোমল ও সুমধুর ভাববিন্যাসের প্রতীক। উষাদেবী এই নৃত্য সৌরাষ্ট্রের

অন্তর্গত দ্বারকার মহিলাদের শিক্ষা দেন এবং ইহাই পরে সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে।

কাহারও মতে, ত্রেত্যযুগের প্রারম্ভে ইন্দ্র একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন এমন কোন বস্তু রচনা করিতে যাহা দ্বারা মানুষের দুঃখকষ্টের লাঘব হয় এবং তাহারা আনন্দ ও শান্তিলাভ করে। ব্রহ্মা তখন ঋগ্‌বেদ হইতে পাঠ্য, সাম্যবেদ হইতে গীত, যজুবেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস সংকলন করিয়া "নাট্যবেদ" নামক পঞ্চমবেদ রচনা করেন। নৃত্য-গীত-বাদ্য এই পঞ্চমবেদের অন্তর্গত।

মহাকাব্যোত্তর যুগটাকে একটা যুগ সন্ধিক্ষণ বলা যায়। ঐ সময় ভারতের বুকে অনেক সমাজ সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক দার্শনিক ও বহু চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল। কাজেই সাংস্কৃতিক বহুমুখীতার সংগে এই নৃত্যকলা সংযুক্ত হয়ে এযুগে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। এই বিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপের মধ্যে আভাস পাওয়া যায় যে বর্ত্তমানের সর্ব্বোচ্চ শিখরারূঢ় রূপের পরিণতি। এই সমস্তের উদাহরণ মেলে জাতকে, পাণিণির ব্যাকরণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, সংগীত কার শিলালি ও কৃশাশ্বরের নামে। সুতরাং নৃত্য, গীত ও বাদ্য আর অভিনয়ে বহুল প্রচার না থাকলে সংগীত সেই যুগের সাহিত্য এবং ব্যাকরণে স্থান লাভ করতো না। খৃঃপূ ৬ শতকে উত্তর ভারত কয়েকটি ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যাদের মহাজনপদ বলা হয়। গান্ধার দেশ এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। সে যুগে মগধ রাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যা মৌর্য্য বংশ নামে পরিচিত ছিল। এই সময় অনেক থের থেরীদের গাঁথা প্রভৃতি রচিত হয়। তাতে নৃত্যের ও গীতের বহু উপাদান পাওয়া যায়। তারপর আসে গুপ্তযুগ। এই যুগই ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত। সংগীতের বিশেষ প্রসারতা জানা যায় সে যুগের মুদ্রা, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে।

৭৫০ খৃঃ অব্দে মুসলমানরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে চলে যেত। ১২০৬ খৃঃ অব্দে সুলতানী যুগের সূচনা—এই সময়ে হিন্দু মুসলমানের যে সাংস্কৃতিক মিলনের সুত্রপাত ঘটতে শুরু করে তার চরম বিকাশ ঘটে মুঘল রাজত্বে। সম্রাট আক্‌বরের সময় ভারতের শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। সেদিনকার নবাবদের দরবারে শিল্পকলা সমূহের বিশেষ সমাদর লাভের সুযোগ ঘটেছিল। বাইরের থেকে নবাগত সংস্কৃতি কোন অস্বীকৃতি লাভ না করে বরং তার সঙ্গে মিলে মিশে এক নূতনতর সংস্কৃতির জন্মলাভ করেছিল; যার ফলে ভারতের ইতিহাসে শিল্প জগতের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছিল। তার পরবর্ত্তী যুগ বর্ত্তমানের ইঙ্গ-ভারতীয় যুগ—যা হল বর্ত্তমান যুগের রূপ পরিগ্রহ করেছে। একেই আমরা বলি আধুনিক যুগ, যার সুত্রপাত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হল ইংরাজদের আগমন। এই সময়ে সংস্কৃতির খাতে পড়েছিল ভাঁটা। কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। পরে ধীরে ধীরে গুণীজনদের আবির্ভাব এ যুগে ঘটার ফলে আবার সংস্কৃতির বুক ছাপিয়ে দেখা যায় অবিশ্রান্ত জোয়ারের স্রোত। এই সময় রাজা রামমোহন, জোড়াশাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর রত্নবৃন্দ, বিবেকানন্দ।

যেমন ভরতনাট্যম্ নৃত্যের যুগান্তকারী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সুযোগ্য অধিকারী পাণ্ডা নাল্লুরের মিনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাইয়ের সুযোগ্য শিষ্য শিষ্যারা এই নৃত্যের গৌরবকে শতগুণে বর্ধিত করেছেন। কথাকলি নৃত্যে গুরু শঙ্করম্ নাম্বুত্রিপাদ, কুঞ্জুকুরু, কৃষ্ণ নায়ার, রাভানি পিল্লাই প্রভৃতি। কথক নৃত্যে ঈশ্বরী প্রসাদজী, ঠাকুর প্রসাদজী, প্রভৃতি, মুণিপুরী নৃত্যে, গুরু আমুবী সিং, গুরু আতম্বাসিং গুরু য়্যাম্বি সিং প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিগণ ভারতীয় দেশী নৃত্যে ধারা চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক ও সংস্কারক। এর পরেও ভারতীয় নৃত্যের প্রগতি বর্ত্তমানে পথে অগ্রসর কালীন অবস্থায় আরও বহু গুণীজনের আবির্ভাব ঘটেছে

যাঁদের অবদান এই এখনকার যুগে নৃত্য জগতের জ্যোতিষ্করূপে আলো বিতরণ করে চলেছেন। এঁদের নাম উল্লেখ না করলে ভারতীয় নৃত্যের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। এঁরা হলেন ৺উদয় শঙ্কর ৺মণি বর্ধন, শ্রীমতী বালা সরস্বতী, শম্ভুমহারাজ, আচ্ছান মহারাজ, ৺মরুথাপ্পা পিল্লাই, গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন। এঁদের অবদানের প্রভাবে ভবিষ্যতে নৃত্য জগতের পরিধি আরও বর্ধিত হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের তিনটি যুগ

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধাপ গুলিকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। (১) প্রাচীন যুগ (২) মধ্যযুগ, (৩) আধুনিক যুগ।

(১) প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হল প্রাচীন যুগ।

(২) ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হল মধ্য যুগ।

(৩) উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে আধুনিক যুগ।

পঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে উপরোক্ত সময়কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (১) হিন্দু যুগ (২) মুস্লিম যুগ ও (৩) ব্রিটিশ যুগ। তাঁর মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি আরও বলেছেন যে, মুসলমানরা এদেশের সঙ্গে শাসক হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করেন ১১শ শতকে এবং প্রায় ১৮শ শতক পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেছেন। তারপর হয় ইংরাজদের আগমন। বৈদিক যুগ থেকে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু যুগ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক এই যুগ ত্রয় ভারতের সংগীতের ইাতহাসে গ্রহণীয় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

নৃত্য শিক্ষার বিভিন্ন সম্প্রদায়
(Different Schools of dance)

৬০০ থেকে ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে নৃত্য শিক্ষার চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে (১) ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা-ভরত, এবং শিব অথবা সদাশিব-ভরত, (২) গন্ধর্ব-নারদ (৩) মুণি-ভরত (৪) নন্দীকেশ্বর। আবার কাহারও মতে কেবল মাত্র তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। সেগুলি নিম্নে উল্লেখিত হল—

(১) ভরতের নাট্য-সম্প্রদায়

(২) নারদীয় গন্ধর্ব সম্প্রদায়

(৩) নন্দীকেশ্বর সম্প্রদায়।

বস্তুতঃ সে যুগে এই তিনটি অথবা চারিটি নৃত্যশিক্ষা সম্প্রদায়ের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

নৃত্যের স্বর্ণময় যুগ (Age of Renaissance)

খৃষ্ট জন্মের দ্বিতীয় শতকটি ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ। এই সময় ভরত মুণি তাঁর অতি বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ নাট্য শাস্ত্রটি রচনা করেন।

৩২ খৃঃ পূ অব্দ থেকে ৬০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত গুপ্ত বা মৌর্য্য যুগকে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। অজন্তা গুহার খোদিত নৃত্য শৈলীগুলি এই যুগেই সৃষ্ট হয়েছিল। অতএব এই দুটি যুগ নৃত্যের ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ।

নৃত্য কাহাকে বলে।

'নৃত্য' কথাটির মূলধাতু হইল "নৃতি"—ইহার অর্থ গাত্র বিক্ষেপণ বা সঞ্চালন করা। বিবিধ কারণে এবং বিবিধ প্রকারে মানুষ অঙ্গ সঞ্চালন করে—কিন্তু তাহাকে নৃত্য বলা যায় না। আমরা সেইরূপ গাত্র বিক্ষেপণ বা অঙ্গ সঞ্চালনকেই নৃত্য বলিব যাহা সুদৃশ্য,

ছন্দোময়, সুনিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। নৃত্য মানুষের অন্তরের আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ অতএব ইহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছান্দিক সঞ্চালন ছাড়াও অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য।

সঙ্গীতে নৃত্যের স্থান।

সঙ্গীতে নৃত্যের স্থান এবং নৃত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য নৃত্য, কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

সঙ্গীত সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষ অন্তরের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য শুধু অঙ্গভঙ্গী করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, কণ্ঠের সুরলহরী ও উহার সহিত যোগ করিত পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে এবং ইহাকে সুছন্দিত করিবার সুবিধার্থে হাতে তালি দিতে বা অন্য কোন বস্তুতে আঘাত করিয়া শব্দ নিংসৃত করিত—ইহাই বাদ্য। কাজেই দেখা গেল জন্মলগ্ন হইতেই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মধ্যে একটি একাত্মতা বর্তমান। ক্রমে ক্রমে নৃত্য ও গীত পরিশীলিত, মার্জিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। এবং মানুষের প্রয়োজন ও আপন অন্তরের শিল্প সৃষ্টির তাগিদে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্মান করিয়াছে। যন্ত্রসংগীতেরও বহু প্রকার রূপান্তর ও পরিমার্জনা হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহা স্বনির্ভর ও স্বয়ং সম্পূর্ণও হইয়াছে। নৃত্য ও গীত এখন আর সর্বদা পরস্পরের সহায়কের ভূমিকা নেয় না—কিন্তু বাদ্যের সহযোগীতা উভয়ের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য। নৃত্য—মূলতঃ আংশিক অভিনয়, গীত—ভাষা ও সুরপ্রদানকারী এবং বাদ্য—সুরজাল ও ছন্দের ধারক। নৃত্য, গীত ও বাদ্য—এই তিনটি পারস্পরিক সহযোগীতা ভিন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান অসম্ভব।

"নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি ত্রয়ী সঙ্গীত মুচ্যতে"—নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই ত্রয়ী সম্মিলনের নামই সঙ্গীত এবং নৃত্য—সঙ্গীতের একটি প্রধান এবং অপরিহার্য অঙ্গ।

নৃত্যের প্রকার ভেদ।

নৃত্যের আঙ্গিক প্রধানতঃ দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য। বীর ও রৌদ্র রসকে উপজীব্য করিয়া যে উদ্ধত ও দৃপ্ত ভঙ্গিমার নৃত্য সৃষ্টি হইয়াছে—তাহাকে তাণ্ডব নৃত্য বলে। ভগবান শঙ্কর এই ধারার স্রষ্টা। এবং লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীসহকারে কোমল, নয়নাভিরাম যে নৃত্য, তাহাকে লাস্য বলা হয়। করুণ ও শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান উপজীব্য। এই ধারার স্রষ্টা দেবী পার্বতী।

সংগীত রত্নাকরে বলা হয়েছে—নৃত্য তাণ্ডব পর্যায়ভুক্ত এবং নৃত্য লাস্য পর্যায়ভুক্ত। উদ্ধত প্রয়োগের নাম লাস্য। তাণ্ডবের তিনটি ভেদ—'বিষম' 'বিকট' ও 'লঘু'। ঋজু ভ্রমনাদিকে তিনি বিষম বলেছেন। বিরূপবেশ-অবয়বকে তিনি 'বিকট' এবং অল্প করণ প্রয়োগকে 'লঘু' বলেছেন।

সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দ্বিবিধ—'পেবলি ও 'বহুরূপ'। লাস্য দ্বিবিধ—'ছুরিত' ও 'যৌবত'।

পেবলি বলিতে অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ বুঝায়।

বহুরূপে উদ্ধত ভাবের প্রকাশ থাকে। নায়িকার ভিতর ভাব রসের বিকাশকে 'ছুরিত' বলে। নর্তক-নর্তকীগণ কর্তৃক লীলাময় মধুর নৃত্যকে যৌবত বলা হয়।

—বৃত্তি—

আচার্য ভরত ব্রহ্মার আদেশ অনুযায়ী নাট্যবেদকে ভারতী সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটি এই চারটি বৃত্তিতে প্রয়োগ করেন। চরিত্র রূপায়ণে, কাহিনীর রস উদ্ভাবন অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীর চিত্তের বিকাশ ও বিস্তারে বৃত্তিই প্রধান সহায়ক।

ভারতী—কোমল-প্রৌঢ় ও কোমল অর্থ প্রকাশক বৃত্তি হচ্ছে ভারতী বৃত্তি। পুরুষ চরিত্র রূপায়ণে এই বৃত্তি বেশী অনুসৃত হয়।

সাত্ত্বতী—প্রৌঢ় ও কোমল-প্রৌঢ় প্রকাশক সাত্ত্বতী বৃত্তি। বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররস অনুকূল কর্মে এবং সামান্য করুণ ও ও শৃঙ্গার রস প্রসঙ্গে অনুসৃত হয়।

কৈশিকী—সুকুমার অর্থ প্রকাশক কৈশিকী বৃত্তি। শৃঙ্গার রসের অনুকূল ভাব প্রকাশে অনুসৃত হয়।

আরভটি—প্রৌঢ় অর্থ প্রকাশক আরভটি বৃত্তি। দম্ভ, মিথ্যাচার ইন্দ্রজাল, অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি প্রকাশে অনুসৃত হয়।

নৃত্য সম্বন্ধে কতকগুলি প্রারম্ভিক অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য

নৃত্যের তিনটি বিভাগ—নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য।

(১) নৃত্ত: ভাবাবিনয় বর্জিত তাল ও লয় সহযোগে পদ-সঞ্চালনকে বলা হয় নৃত্ত।

(২) নৃত্য: নাট্য ও নৃত্তের সম্মিলিত বিষয় হইল নৃত্য। লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাল ও লয়ের সংযোগে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করাকে বলা হয় নৃত্য।

(৩) নাট্য (নাটক): কথকতা অঙ্গভঙ্গী সহযোগে ভাব ব্যক্ত করাকে বলে নাট্য বা অভিনয়।

তিন প্রকার শরীর ভেদ: (১) অঙ্গ: মনুষ্য শরীরের প্রধান ভাব সমূহকে অঙ্গ বলে। অঙ্গ ছয় প্রকার—শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, পার্শ্বদ্বয়, কটী ও পদদ্বয়।

(২) প্রত্যঙ্গ: ইহাও ছয় প্রকার; যথা—স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়।

(৩) উপাঙ্গ: ইহা বারো প্রকার; যথা—নেত্র, ভ্রু, অক্ষিপুট, তারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, হনু, (গণ্ডাস্থি), অধর, দন্ত, জিহ্বা, চিবুক ও মুখ।

চারী

'চারী' মানে চলন ভঙ্গী। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, একই সময় পাদ, উরু, জংঘা ও কটি দেশকে বৈচিত্র্য সহকারে সঞ্চালন করার নাম চারী। নাট্যে চারী অতি প্রয়োজনীয়। অভিনয় দর্পণে বলা হইয়াছে গতিপ্রধান হইতেছে 'চারী' এবং স্থিতিপ্রধান হইতেছে 'স্থান'।

চারী দুই প্রকারের—ভূমিচারী ও আকাশচারী। পদযুগলের দ্বারা ভূমির উপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে পদচারণাকে বলা হয় "ভূমিচারী" এবং পদযুগল উঁচুদিকে উৎক্ষেপ করে চারণাকরাকে বলা হয় 'আকাশচারী'।

রুশীয় ব্যালে নৃত্যে "আকাশচারীর" রকমারি প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতীয় নৃত্যে সচরাচর এই ধরণের আকাশচারী প্রদর্শিত হতে দেখা যায় না যদিও ইহা ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। একই স্থানে দাঁড়িয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনকেও এক প্রকার চারী বলা হয়। কোন কোন মতে বলা হয়, কোমর থেকে পা পর্যন্ত অঙ্গের অংশ দ্বারা যে সব মুদ্রাদি দেখানো হয় তাকেই বলা হয় চারী। চারী থেকেই করণ, মণ্ডল প্রভৃতি রচিত হয়।

অভিনয়

কোন কাহিনীকে অঙ্গসজ্জা, অঙ্গভঙ্গী, ভাষার সাহায্যে দর্শকের সম্মুখে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত করাকেই 'অভিনয়' বলা হয়।

অভিনয়কে চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন—

(১) **আঙ্গিক**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কলাপূর্ণ সঞ্চালনে যে অভিনয় তাহাই হইল আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত। নৃত্যেও যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ বিক্ষেপ হয় তখন তাহা আঙ্গিক অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে।

(২) বাচিক—বাক্যপাঠ বা আবৃত্তির দ্বারা যে অভিনয় করা

হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই বলা হয় বাচিক অভিনয়। নৃত্যে যখন কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাহায্য নেওয়া হয় এবং মুখে বোল, কবিত্ব বলা হয় তখন সেই নৃত্য বাচিক অভিনয়ের পর্য্যায়ে পড়ে।

(৩) আহার্য্য—অভিনয়ের সময়ে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা যখন চরিত্র উপযোগী বেশভূষা অঙ্গসজ্জা করেন, পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দৃশ্যপটাদি দ্বারা মঞ্চসজ্জা করা হয় তখন তাহা হয় আহার্য অভিনয়ের অন্তর্ভূক্ত। নর্তক-নর্তকীকে চরিত্র অনুযায়ী অঙ্গ আভরণে অলংকৃত ও বেশভূষা দ্বারা সজ্জিত হইতে হয়। অতএব নৃত্যেও আহার্য্য অভিনয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে।

(৪) সাত্ত্বিক—মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতে যে অভিনয় তাহাই হইল সাত্ত্বিক অভিনয়। শাস্ত্রে আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের বর্ণনা দেওয়া আছে,—স্তম্ভ (স্থিরভাব), স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্পন), বৈবর্ণ্য (বিবর্ণতা) অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা বা অচৈতন্য)। নৃত্যে সাত্ত্বিক অভিনয় অপরিহার্য্য। নৃত্য মানেই ভাবাভিনয়। ভাবাভিনয় ব্যতীত নৃত্য প্রদর্শিত হইতে পারে না। অতএব নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়।

করণ

হস্তপদ ও কটিদেশের (কোমর) সঞ্চালনকে করণ বলা হয়। 'সঙ্গীত রত্নাকরে' চারিটি করণের উল্লেখ আছে। সেইগুলি নিম্নে দেওয়া হল—

আবেষ্টিত, উদবেষ্টিত, ব্যবর্তিত ও পরিবর্তিত।

শাস্ত্রে ১০৮টি করণের উল্লেখ আছে।

দ্বি-পাদ-ক্রমণকে করণ বলা হয় (দুই পদের সঞ্চালনে করণ হয়)। তিন করণে "খণ্ড" হয় এবং তিন বা চার খণ্ড সংযোগে "মণ্ডল" হয়।

আবেষ্টিত—তর্জনী হতে এক এক করে অঙ্গুলি বন্ধ করা।

উদ্‌বেষ্টিত—হাত ঘুরিয়ে উর্দ্ধমুখ মুষ্টি, তর্জনী হতে এক এক করে অঙ্গুলি খোলা।

বিবর্ত্তিত—উর্দ্ধমুখ হস্ত, কনিষ্ঠা হতে এক এক করে অঙ্গুলি বন্ধ করা।

পরিবর্তিত—অধোমুষ্টি, কনিষ্ঠা হতে এক এক করে অঙ্গুলি খোলা।

স্থানক

বিভিন্ন প্রকার দাড়াইবার ভঙ্গীকে স্থান বা স্থানক বলে। পাদ বিন্যাসের ভেদে 'স্থানক' নির্দিষ্ট হয়। নাট্যশাস্ত্রে ছয় প্রকার স্থানের নাম উল্লেখ আছে—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়।

অভিনয় দর্পণেও ছয় প্রকার স্থানের নাম উল্লেখ আছে—সমপাদ একপাদ, নাগবন্ধ, ঐন্দ্র, গারুড় ও ব্রাহ্ম (ব্রহ্ম স্থান)।

নাট্যশাস্ত্রে স্থান নির্দেশে তাল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে; এক্ষেত্রে তাল অর্থে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত হলে যে বিস্তৃতি ঘটে সেই পরিমিত স্থান বুঝতে হবে।

বৈষ্ণব—দুইপদ আড়াই তাল অন্তরে স্থাপিত হইবে এবং তাহার ভিতর একটি ত্র্যস্র ও অপরটি পক্ষস্থিত হইবে। জঙ্ঘা কিঞ্চিৎ অঞ্চিত (বক্র) হইবে এবং অঙ্গে সৌষ্ঠব থাকিবে। ইহাকে 'বৈষ্ণব' স্থান বলা হয়। ইহার অধিদেবতা হইতেছেন বিষ্ণু। স্বাভাবিক সংলাপে ইহার প্রয়োগ হয়।

সমপাদ—'সমপাদে' দুইটি পদই একতাল অন্তরে স্থাপিত হইবে ও অঙ্গে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব থাকিবে। ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা। দ্বিজ কর্তৃক আশীর্বাদে, পক্ষিরূপধারণে, বরদানে, কৌতুকে, শূন্যমার্গে রথে ও বিমানে অবস্থানে ইহার প্রয়োগ হয়।

বৈশাখ—সাড়ে তিনতাল অন্তরে উরু 'নিষন্ন' থাকিবে। পদদ্বয়

ত্র্যস্র ও পক্ষস্থিত থাকিবে। ইহাকে 'বৈশাখ' বলে। ইহার অধি-দেবতা স্কন্দ। ব্যায়ামে, অশ্বের বাহনে, স্থূলপক্ষী-নিরূপণে, ধেনু আকর্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়।

মণ্ডল—রেচকে ইহা কর্তব্য। পদদ্বয় চারি তাল অন্তরে থাকিবে ও ত্র্যস্র এবং পক্ষস্থিত হইবে। কটি ও জানু সমভাবে থাকিবে। ইহাকে ভরত 'মণ্ডলস্থান' বলিয়াছেন। ধনু, বজ্র, প্রহরণ, হস্তীর বাহন ও স্থূলপক্ষী-নিরূপণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আলীঢ়—মণ্ডলস্থানকের দক্ষিণ পদ পঞ্চতাল প্রসারিত করিয়া এই 'স্থানক' করিতে হয়। রুদ্র ইহার অধিদেবতা। বীর ও রৌদ্ররসে ইহা ব্যবহার করা হয়। রোষে, অমর্ষে, মল্লগণের আস্ফালনে, শত্রু-নিরূপণে ও অস্ত্রমোক্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়।

প্রত্যালীঢ়—দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত করিয়া 'আলীঢ়' স্থানের পরিবর্তন করিলে 'প্রত্যালাঢ়ে' হয়। আলীঢ় স্থানকে শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া প্রত্যালীঢ়ে মোক্ষণ করিতে হয়।

একপাদ—সমপাদের একটি পদের জানু উর্ধ্বে উত্থিত করিয়া পদটির বাহিরের পার্শ্ব অন্য পদটির বাহিরের পার্শ্বভাগের সহিত যুক্ত করিলে 'একপাদ' স্থানক হয়।

নাগবন্ধ—উপবেশন করিয়া বাম উরুর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ জঙ্ঘা ন্যস্ত করিলে 'নাগবন্ধ' হয়।

গারুড়—ভূমিতে উভয় জানু স্থাপন করিয়া কুঞ্চিত অবস্থায় বামপদ সম্মুখে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিলে 'গারুড়স্থান' হয়।

ব্রাহ্ম—একটি পদ সমভাবে রাখিয়া অপর পদটি জানুসন্ধি পর্যন্ত কুঞ্চিত করিয়া পৃষ্ঠদেশে উৎক্ষিপ্ত করিলে 'ব্রাহ্মস্থান' হয়। অভিনয় দর্পণের পুরুষস্থানে বর্ণিত ব্রাহ্মস্থানের সহিত ইহার কোনো সঙ্গতি নাই। কেহ কেহ সঙ্গীত রত্নাকরে বর্ণিত সমপাদকেই ব্রাহ্মস্থান বলিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা।

ভাব

যাহার দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাই "ভাব"। "ভাব" হইতেছে কারণ, ভাবের পরিণাম হইতেছে রস। স্থায়ীভাব হতে রসের সৃষ্টি। আট প্রকার স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, যথা—রতি ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, হাস, জুগুপ্সা (ঘৃণা)। নাট্য-শাস্ত্রে এই আটটি স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, কিন্তু অলংকার শাস্ত্র-কারদের মতানুযায়ী আর একটির উল্লেখ আছে, সেটি হল নির্বেদ (বৈরাগ্য বা নৈরাশ্য)। 'স্থায়ীভাবকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ—বিভাব, অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাব। লৌকিক জগতে যাহা রতি ভাবাদির উদ্বোধক, কারণ বা হেতু, কাব্য ও নাট্যজগতে তাহাই বিভাব। শকুন্তলার রূপ ও গুণ প্রভৃতির দ্বারা দুষ্মন্তের মনে রতিভাবের উদয় হইল, এই সকল কারণগুলি কাব্য ও নাট্যে বিভাব। অর্থাৎ যে কারণে ভাবের প্রকাশ ঘটে, সেই কারণকে 'বিভাব' বলা হয়। বিভাবের দুটি উপবিভাগ আছে—'আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে ভাবের (রতি) উদয় হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে। শকুন্তলা, দুষ্মন্ত ইত্যাদি। যে বিষয় বা ঘটনা ঐ ভাবকে উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত করে তাহাকে বলা হয় 'উদ্দীপন' বিভাব। বেশভূষা, রূপ, দেশ, মলয়পবন ইত্যাদি। আর একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাইতে পারে। নায়কের বিরহে নায়িকা কাতরা। বিরহিনী নায়িকার এই কাতরতাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করছে নেপথ্য সঙ্গীত (Back Ground Music)। এখানে নায়িকা 'আলম্বন' এবং নেপথ্য সঙ্গীত হইল 'উদ্দীপন'। 'অনুভাব' হল ভাবেরই পরিণাম। যে লক্ষণগুলি দ্বারা ভাব পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি কারণ সমূহের দ্বারা উদ্দীপ্ত রতিভাবের বহিঃপ্রকাশরূপ কার্যকে 'অনুভাব' বলে। সাত্ত্বিক ভাব—ইহা অনুভাবেরই অন্তর্গত। মন সমাহিত হইলেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ সমাহিত মন

লেখক

শিল্পী—অনুপশঙ্কর

বিশ্ববিশ্রুত নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয় শঙ্কর ও অমলা শঙ্কর
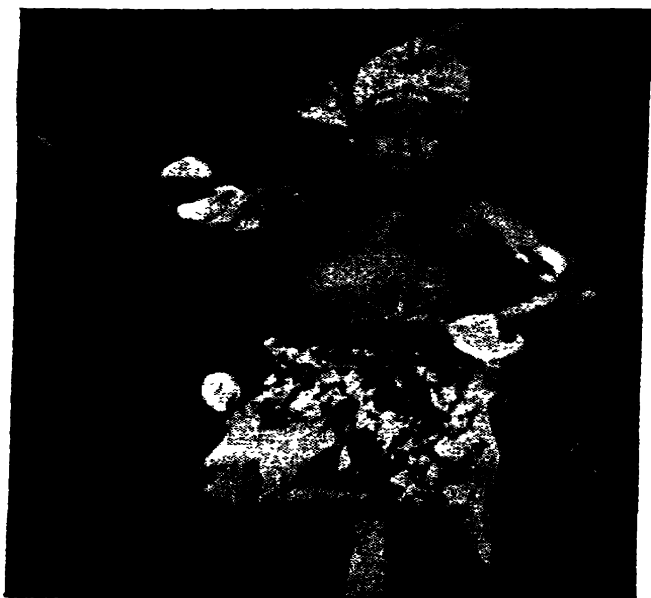
বস্তুজগতের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে এবং একটি গভীর অনুভূতির ভিতর ডুবিয়া যায়। এই অনুভূতি গাঢ় হইলেই বাহ্যজ্ঞান লোপ করিয়া দেয়। ইহা আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু বৈবর্ন, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

নয়টি স্থায়ীভাব ছাড়া আর একটি ভাব আছে তাকে 'সঞ্চারীভাব' বলে। স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব-এর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্থায়ী ভাবকে তার সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করে তুলতে সাহায্য করে এই সঞ্চারী ভাব। নির্বেদ, হর্ষ. বিষাদ, মদ, উগ্রতা, শংকা, আবেগ স্মৃতি. লজ্জা, গর্ব প্রভৃতি সঞ্চারীভাব।

রস

ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে রস স্ফুরণের মাধ্যমে। এই কারণেই রস সৃষ্টিকে ললিত কলার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়েছে ; এই উক্তির আলো নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রতিফলিত হয়েছে—

ন ভাব রসহীনইস্তি ন রস ভাব বর্জিত
পরস্পর কৃতা সিদ্ধিরণয়োঃ রসভাবায়োঃ ॥

এই কারণেই সঙ্গীত শাস্ত্রে নয়টি রসের উদ্ভব ঘটেছে।

শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকঃ
বীভৎসাদ্ভুত শান্তাশ্চ নবনাট্য রসাঃ স্মৃতা ॥

অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত, এই নয়টি রসের সৃষ্টি হয়েছে।

রসগুলি কি ভাবে অভিব্যক্তি হয় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে।

শৃঙ্গার—এই রসের স্থায়ীভাব রতি বা প্রেম। প্রেমকে

দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে—সাত্ত্বিক ও দাম্পত্য। শৃঙ্গারের অন্য দুইটি অবস্থার নাম হল সম্ভোগ (মিলন) ও বিপ্রলম্ভ (বিরহ)।

হাস্য—এই রসের স্থায়ীভাব হাস্য। অসঙ্গতিপূর্ণ অঙ্গ-ভঙ্গি এবং আচার-ব্যবহারের দ্বারা যদি কৌতুক সৃষ্টি হয় তাহা হইলে হাস্য রসের উৎপত্তি হয়।

করুণ—করুণ রসের স্থায়ীভাব শোক। শোক ও দুঃখে করুণ রসের উৎপত্তি। মূর্চ্ছা, ক্রন্দন ও মাথা-কপাল চাপড়ানো ইত্যাদি এই রসে প্রকাশিত হয়।

রৌদ্র—এই রসের স্থায়ীভাব ক্রোধ। মনে ক্রোধের উদয় হইলে এই রসের উৎপত্তি। অর্থাৎ উন্মত্ততা এই রসে প্রকাশিত হয়।

বীর—এই রসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। গর্ব্ব, অহঙ্কার, শক্তি ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হইলে বীর রসের উৎপত্তি হয়।

ভয়ানক—স্থায়ীভাব ভয়। কোন কিছু দর্শনে ভীত হইয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ভয়, কম্পন প্রভৃতি হয় তা হলে ভয়ানক রসের উৎপত্তি হয়।

বীভৎস—ইহার স্থায়ীভাব জুগপ্সা (ঘৃণা)। দুর্গন্ধ, কুবচন, অশ্লীল কার্য, বধ বা হত্যা এবং ঘৃণার ভাব মনে উদয় হইলে বীভৎস রসের উৎপত্তি হয়।

অদ্ভুত—এই রসের স্থায়ীভাব বিস্ময়। বিস্ময় ও আশ্চর্য-এর অভিব্যক্তি হইতেছে অদ্ভুত রস।

শান্ত—এই রসের স্থায়ীভাব হল নির্বেদ (বৈরাগ্য)। অন্য রসের অনুভূতি ব্যতীত মনের যে সাম্যভাব তাকেই শান্ত বলা যায়।

এই রস সাধারণতঃ ভক্তিমূলক। ইহা মনে প্রশান্তি ও আনন্দ এনে দিতে সক্ষম।

প্রত্যেক রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ভরত নাট্যশাস্ত্রে নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে—

রস	বর্ণ	অধিদেবতা
শৃঙ্গার	শ্যাম	বিষ্ণু
হাস্য	সিত (সাদা)	প্রমথ
করুণ	কপোত	যম
বীর	হেম	মহেন্দ্র
ভয়ানক	কৃষ্ণ	কাল
রৌদ্র	রক্ত	যম
বীভৎস	নীল	মহাকাল
অদ্ভুত	পীত	ব্রহ্মা।

অভিনয়-নৃত্য

নাট্যের অন্তর্গত অভিনয়। নৃত্যের সঙ্গে নাট্য ও অভিনয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। নৃত্যশিক্ষার্থীকেও অভিনয় সম্পর্কে পাঠ লইতে হয়। কোন চরিত্রকে কৃত্রিম ভাবে প্রকাশ করাকে অভিনয় বলা হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাটি যে পাত্র প্রদর্শন করিতেছেন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ না হইয়াও ঐ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলি এমন নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করেন, যেন ঐ ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণরূপে কল্পনা করিতে পারে। এই কৃত্রিম অভিব্যক্তিকেই বলা হয় অভিনয়।

ভাব ও রস

ভাব ও রস-এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। একটি অপরটির পরিপূরক। নৃত্যের সঙ্গে এই দুইটির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। ভাব হ'তে রসের উৎপত্তি। যেখানে ভাব সেখানে রসসৃষ্টি। সুতরাং নৃত্যে ভাব ও রস এর অভাব হলে দর্শককে আনন্দ দিতে পারে না। নৃত্যের মাধ্যমে নবরসের অভিনয় করতে হলে ভাবের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ভাবের অন্তর্গত রস।

নৃত্যে ভাবের প্রয়োজন

নৃত্য কলার কোন ভাষা নেই। ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা অর্থাৎ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দিয়ে। তাই নৃত্যকে বলা হয় গাত্র বা অঙ্গবিক্ষেপ। দেহভঙ্গি বা হাতের মুদ্রাগুলি এইভাব প্রকাশের সহায়ক। অভিনয় দর্পণে উল্লেখ আছে—যেখানে হাত সেখানে দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি, সেখানে মন, যেখানে মন সেখানে ভাব, যেখানে ভাব সেখানে রসসৃষ্টি; সুতরাং নৃত্যে ভাবের অভাব হলে সে নৃত্য দর্শককে আনন্দ দিতে পারে না। নৃত্যের মাধ্যমে নবরসের অভিনয় করতে হলে ভাবের বিশেষ প্রয়োজন।

নৃত্যে ঘুংগুরের প্রয়োজন

ভারতীয় নৃত্যের জন্য ঘুংগুর অত্যন্ত প্রয়োজন। কথক নৃত্যে ঘুংগুর অপরিহার্য। এতে পায়ের কাজই বেশী। অভিনয় দর্পণের মতে ঘুংগুর কাংস্যনির্মিত হবে এবং এক-এক পায়ে এক-এক শত পরতে হবে। শাস্ত্রকারদের মতে সূতার রং নীল রংয়ের হওয়া উচিত এবং একটি করে ঘুংগুর ও একটি করে গাঁট দিয়ে তৈরী করতে হয়। কথক নৃত্য অভ্যাস করিবার জন্য এক-এক পায়ে যত বেশী ঘুংগুর হবে তত বেশী পা বসে যাবে এবং তৈয়ারী হবে। চক্কর (ভ্রমরীর) অভ্যাসের জন্য ভারী ঘুংগুর প্রয়োজন। কারণ পায়ে বেশী ওজন হলে ব্যালান্স রাখার অর্থাৎ ঘুরে সোজা হয়ে একই জায়গায় দাঁড়াইবার সুবিধা হয়। কিন্তু কথাকলি, ভরতনাট্যম ও মণিপুরী নৃত্যে ভারী ঘুংগুর-এর প্রয়োজন হয় না। অল্প ঘুংগুর হলেই এই সকল নৃত্য চলতে পারে। ভারতীয় প্রায় সকল নৃত্যই অল্প-বেশী ঘুংগুরের প্রয়োজন হয়।

নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা

কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি হইতেছে তাহার শিল্প ও কলার মান, ব্যাপ্তি ও সাধনা। ভারতীয় সভ্যতার ও কৃষ্টির

যখন পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল তখন গীত, বাদ্য বা নৃত্য কেবলমাত্র বিলাসের এবং তাৎক্ষণিক আনন্দের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত না ; সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম পন্থা বলিয়াও গণ্য হইত। ইতর জন্তুর মতো শুধুমাত্র দেহের ক্ষুধা মিটাইয়া মানুষ তৃপ্ত নয়। মনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য, হৃদয়বৃত্তির তাগিদে তাই মানুষ করিয়াছে শিল্প সৃষ্টি। যাহা জীবনের অসংখ্য জটিলতার মধ্যেও মানুষের নয়নকে দেয় তৃপ্তি, মনকে দেয় আনন্দ। যাহা দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি ও মানবিক অনুভূতিগুলি উৎকর্ষতা লাভ করে।

মানুষ সামাজিক প্রাণী। উন্নততর সমাজ গঠনের জন্য চাই মানুষের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টিসাধন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন। নৃত্যের দ্বারা মানুষের দৈহিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক আনন্দলাভ হয়। নৃত্য, মানুষের চিত্তের দুশ্চিন্তা ও অবসাদ অপনোদন করিয়া, উত্তম ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। নৃত্যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হয় বলিয়া ইহা শরীর চর্চার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং নিজে আনন্দলাভ করিতে ও অন্যকে আনন্দ দিতে নৃত্যের ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য্য।

নৃত্যকলার দ্বারা মানুষের অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই সকল কারণে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে নৃত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

নায়ক-নায়িকাভেদ

নায়ক-নায়িকার ভেদাভেদ নিরুপন করিতে হইলে প্রথমে জানা প্রয়োজন নায়ক ও নায়িকা কাহাকে বলে।

নায়ক—কোন নাটকে যিনি পুরুষ চরিত্রের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন তাঁকে "নায়ক" বলা হয়।

নায়িকা—যিনি স্ত্রী চরিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন তাঁকে "নায়িকা" বলে।

কথাকলি, ভরতনাট্যম্ ও মণিপুরী প্রভৃতি নৃত্যে স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী করিয়া থাকেন, কিন্তু কথক নৃত্যে একজন শিল্পীই স্ত্রী ও পুরুষ উভয় চরিত্রই অর্থাৎ একই পোষাক, ও রূপসজ্জায় বালক, কৃষ্ণ ও রাধা প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা করেন ভাব অভিব্যক্তির দ্বারা।

এই প্রসঙ্গে নিম্নে নায়ক-নায়িকা ভেদের উল্লেখ করা হইতেছে।

নায়ককে প্রধানত চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশপান্ত ও ধীরোদ্ধত।

ধীরোদত্ত—ধীরোদাত্ত পর্য্যায়ে পড়ে সুদৃঢ়, বিচারশীল, যে কোন অবস্থায় অবিচল প্রভৃতি নায়কেরা।

ধীরললিত—ধীরললিত পর্য্যায়ে পড়ে কলাপ্রেমিক, সুখী, পরিহাসবিশারদ, কিশোর ও মৃদুভাষী প্রভৃতি।

ধীরপ্রশান্ত—ধীরপ্রশান্ত পর্য্যায়ে পড়ে শান্ত প্রকৃতির, সাত্বিক ধীর ও বিনয়াদিগুণযুক্ত প্রভৃতি নায়কেরা।

ধীরোদ্ধত—অহংকারী ঈর্ষাপরায়ন, কপট, মায়াবী ও চঞ্চল প্রভৃতি নায়কেরা।

নায়িকাকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা স্বকীয়া, পরকীয়া, সামান্যা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা ও বাসকসজ্জা।

স্বকীয়া—স্বকীয়া নায়িকা পর্য্যায়ে পড়ে সুশীলা, লজ্জাবতী, পতিপরায়ণা প্রভৃতি নায়িকারা।

পরকীয়া—পরকীয়া পর্য্যায়ে পড়ে পর, অর্থাৎ অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নায়িকারা।

সামান্যা—সামান্যা পর্য্যায়ে পড়ে লোভ, কুটীলতা, দুঃসাহসিকতা প্রভৃতি অবগুণ যার স্বধর্ম। কেহ কেহ এই শ্রেণীর নায়িকাকে গণিকা বলিয়া চিহ্নিত করেন।

খণ্ডিতা—খণ্ডিতা পর্য্যায়ে পড়ে অন্যনারী সঙ্গের চিহ্নাদিযুক্ত নায়ক দর্শনে কুপিতা বা ঈর্ষান্বিতা প্রভৃতি নায়িকারা।

কলহান্তরিতা—কলহান্তরিতা পর্য্যায়ে পড়ে নায়কের সঙ্গে কলহজনিত বিচ্ছেদ বেদনায় অতিশয় অনুতপ্ত নায়িকা।

বিপ্রলব্ধা—বিপ্রলব্ধা পর্য্যায়ে পড়ে প্রতারিত নায়িকা। অর্থাৎ সংকেত করিয়া প্রিয়তম যদি আগত না হয়, তাহা হইলে যে নায়িকা সাক্ষাৎ-বঞ্চিতা।

উৎকণ্ঠিতা—উৎকণ্ঠিতা পর্য্যায়ে পড়ে প্রিয়ের আগমন বিলম্ব-হেতু উৎকণ্ঠিতা নায়িকা।

বাসকসজ্জা—বাসকসজ্জা পর্য্যায়ে পড়ে নায়কের আগমন আশায় দেহ ও গেহ সুসজ্জিত করিয়া যে নায়িকা অপেক্ষা করে।

শিরোভেদ

নৃত্যে 'শির'-এরও একটি বিশেষ স্থান আছে। নাট্যশাস্ত্রে তের প্রকার শিরঃকর্মের উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শিরোভেদ হইতেছে আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, আধুত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত, কিন্তু অভিনয় দর্পনে নয় প্রকার শিরোভেদের কথা বলা হয়েছে—সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত ও পরিবাহিত। নাট্যবিদরা প্রধানতঃ এই গুলিই ব্যবহার করেন। অভিনয় দর্পনের মতানুসারে—

সম—নিশ্চল শিরকে 'সম' বলে।

উদ্বাহিত—ওপর দিকে তোলা অর্থাৎ মুখ উর্দ্ধে উন্নত হইলে "উদ্বাহিত" হয়।

অধোমুখ—ভূমির দিকে নমিত বদন 'অধোমুখ' বলিয়া খ্যাত।

আলোলিত—মণ্ডলাকার চারিদিকে ভ্রমিত হইলে 'আলোলিত মস্তক হয়।

ধুত—বাম ও দক্ষিণে চালিত 'শির'কে 'ধুত' বলে। নিদ্রার উদ্বেগ, পার্শ্বদেশ দর্শনে, ভীত, মদ্যপানের অবস্থায়, বিষাদ প্রকাশে ইহার প্রয়োগ হয়।

কম্পিত—উপরে-নীচে সঞ্চালন করাকে কম্পিত বলে। ক্রোধে তর্জনে 'কম্পিত শির' প্রযুক্ত হয়।

পরাবৃত্ত—পিছনের দিকে মস্তক ঘোরানোকে "পরাবৃত্ত" বলে।

উৎক্ষিপ্ত—দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে ও ঊর্ধ্ব ভাগে চালিত শিরকে উৎক্ষিপ্ত বলে।

পরিবাহিত—উভয় পার্শ্বে চামরের মত চালিত শিরকে "পরিবাহিত" বলে।

গ্রীবাভেদ

গ্রীবা-র অর্থ ঘাড় বা গলা, নাট্যশাস্ত্র মতে গ্রীবাভেদ নয় প্রকার এবং অভিনয় দর্পনের মতে চারিপ্রকার গ্রীবাভেদের উল্লেখ আছে।

নাট্যশাস্ত্রমতে সমা, নতা, উন্নতা, এ্যস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও বিবৃত্ত।

সমা—ধ্যান, জপ প্রভৃতি বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়,

নতা—গ্রীবা নত অবস্থায় থাকে। কণ্ঠলগ্ন অলঙ্কার বন্ধনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

উন্নতা—ঊর্ধ্বমুখী গ্রীবাকে উন্নতা বলে। উন্নতা গ্রীবা ঊর্ধ্বে অবস্থিত বস্তুদর্শনে ব্যবহৃত হয়।

এ্যস্রা—গ্রীবা পার্শ্বগত হইলে 'এ্যস্রা' হয়।

রেচিতা—গ্রীবা কম্পিত ও আন্দোলিত হইলে 'রেচিতা' হয়, ইহা মথনে ও নৃত্তে ব্যবহৃত হয়।

কুঞ্চিতা—গ্রীবা ঈষৎ অবনত হইলে 'কুঞ্চিতা' হয়, মস্তকে ভারবহন, গলরক্ষণ প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

অঞ্চিতা—ঊর্ধ্বে ঈষৎ অপসৃত হইলে "অঞ্চিতা" হয়। উদ্বন্ধ কেশকর্ষণে ও ঊর্ধ্বদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বলিতা—গ্রীবা পার্শ্ব অভিমুখী হইলে "বলিতা" হয়। গ্রীবাভঙ্গে ও পার্শ্ববিক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বিবৃত্তা—গ্রীবা অভিমুখী হইলে 'বিবৃত্তা' হয়। স্বস্থানে ও অভিমুখে ইহা প্রযুক্ত হয়।

অভিনয় দর্পণে চারিপ্রকার গ্রীবাভেদ মানেন—সুন্দরী, তিরশ্চীনা, পরিবর্তিতা ও প্রকম্পিতা।

সুন্দরী গ্রীবা—তির্য্যকভাবে চালিত গ্রীবাকে "সুন্দরী গ্রীবা' বলে।

তিরশ্চানা'—সর্পগতিতে চালনা গ্রীবাকে "তিরশ্চীনা গ্রীবা" বলে।

পরিবর্তিতা গ্রীবা—বাম ও দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চালিত গ্রীবাকে "পরিবর্তিতা গ্রীবা" বলে।

প্রকম্পিতা গ্রীবা—সম্মুখে ও পশ্চাতে চালনা অর্থাৎ কপোতের কণ্ঠ কম্পনের মত কম্পিত গ্রীবাকে 'প্রকম্পিতা গ্রীবা' বলে।

ভ্রূকর্ম্ম ভেদ

নাট্যশাস্ত্র মতে : ভ্রূকর্ম্ম সাত প্রকার, যথা :—উৎক্ষিপ্ত, পতন, ভ্রূকুটি, চতুর (প্রসারিত), কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ।

দৃষ্টি ভেদ

অভিনয় দর্পণের মতে দৃষ্টিভেদ আট প্রকার, যথা :—

সম (স্বাভাবিক), আলোকিত (বিস্ফারিত), সাচী (তির্য্যক দৃষ্টি,) প্রলোকিত (উভয় পার্শ্বে দেখা), নিমীলিত (অর্দ্ধদৃষ্টি), উল্লোকিত (উর্দ্ধে দেখা) অনুবৃত্ত (দ্রুত উর্দ্ধে ও অধোদর্শন) ও অবলোকিত (অধোভাগে দর্শন)।

মার্গীনৃত্য ও দেশীনৃত্যে তুলনা মুলক সমালোচনা

মার্গীনৃত্য—এই শ্রেণীর নৃত্য অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগের পূর্বকাল থেকে বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। সেই যুগের মুনি ঋষিরা ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে এই নৃত্যের সৃষ্টি করে-

ছিলেন। এই নৃত্যের উদ্দেশ্য ছিল উপাস্য দেব অথবা দেবীকে প্রসন্ন করা। প্রাচীন কালের মানুষ উপলব্ধি করেছিল যে সংগীত দ্বারা মানব মনের একাগ্রতা আসে, তাই কেউ গীত, কেউ বাদ্য এবং কেউ নৃত্যে যে যার মনোনিয়োগ করত। সেই কারণেই ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে এই নৃত্যের প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছিল।

এই মার্গী নৃত্যের আচার্য ছিলেন ব্রহ্মা। তিনি সর্বপ্রথম ভরত মুনিকে এই শিক্ষা দেন। ভরত মুনি, তাঁর প্রণোদিত "ভরতনাট্যম" এর মাধ্যমে এই শিক্ষার প্রসার শুরু করেন। ভরত মুনির নাট্য-শাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নাট্যশাস্ত্র গীত, বাদ্য ও নৃত্যের প্রয়োগ স্বর্গের গন্ধর্বরা ও তাঁদের কন্যাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গন্ধর্ব কন্যাদের অপ্সরা বলা হ'ত। তাঁরা এই নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতা ও মুনিদের চিত্ত বিনোদন করতেন।

মার্গী নৃত্য শাস্ত্রের কঠিন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। যিনি এই সুকঠিন নিয়মাবলী পালন করতে পারতেন তিনিই এই নৃত্য শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারতেন। এই নৃত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর প্রাপ্তি। তাই ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন রস এই নৃত্যে প্রযোজ্য করার সম্ভাবনা ছিল না। মার্গী নৃত্য শিক্ষার ব্যাপারে ব্যাপারে অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন থাকায় ধীরে ধীরে এই নৃত্য বিলুপ্ত হইয়া গেছে। বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদী নৃত্য (Classical dance) মার্গী নৃত্যের পর্য্যায় পড়ে না।

মার্গী-নৃত্যের বিভিন্ন নামাবলী—(১) লক্ষণ তাণ্ডব, (২) উপাসনা তাণ্ডব, (৩) বৃত্তি তাণ্ডব, (৪) সপ্তরস নৃত্য (৫) আরভটী নৃত্য (৬) কলমান নৃত্য (৭) ষোড়শ সংস্কার নৃত্য (৮) পঞ্চতত্ত্ব নৃত্য (৯) শব্দ নৃত্য (১০) গতি নৃত্য (১১) চমৎকার নৃত্য (১২) কট্টরি নৃত্য (১৩) কল্প নৃত্য—

দেশী নৃত্য—মুনি ঋষিরা প্রাচীনকালে অনুভব করেছিলেন যে

ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা ছাড়াও নৃত্যের মধ্যে আরেকটি আকর্ষণীয় শক্তি নিহিত আছে, যা মানুষকে আকৃষ্ট করে তার জীবনকে আনন্দময় করে তোলে। এই উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁরা এক নতুন নৃত্য শৈলার সৃষ্টি করেন। এই নৃত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মার্গী নৃত্য এবং দেশী নৃত্য। দেশী নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানব মনো-রঞ্জনের দ্বারা তার জীবনকে সুখময় করা। বর্ত্তমানে এই নৃত্যের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যেমন, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের অভিরুচি সমান ভাবে পা মিলিয়ে চলে; সেই পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তনের সঙ্গে এই নৃত্যের বহু রূপান্তর ঘটেছে। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই নৃত্যের কালে কালে রূপ বদল করেছে। পঞ্চম বেদের নৃত্যকলা ভূমণ্ডলে বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান কালে দেশী নৃত্যকলা ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী নৃত্যরূপে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান ও প্রাচীনকালের দেশীনৃত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে আকাশ পাতাল। এই কারণেই প্রাচীনকালের নৃত্যরত মুর্ত্তির মুদ্রা এবং আধুনিক কালের নৃত্যের মুদ্রার মধ্যে অনেক তফাৎ লক্ষ করা যায়।

মার্গী নৃত্য	দেশী নৃত্য
(১) এই নৃত্য ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর প্রাপ্তী।	(১) এই নৃত্য মানব সৃষ্টি করেছে। ইহার উদ্দেশ্য মানবকে আনন্দ দেওয়া।
(২) ইহা অতি প্রাচীন ও কঠিন নিয়ম-নিষেধের বাঁধন কষণে আবদ্ধ। ইহার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।	(২) ইহাও অতি প্রাচীব নৃত্য, কিন্তু কঠিন নিয়ম-কাননে বদ্ধ নহে। ইহা পরিবর্ত্তনীয়।

(৩) এই নৃত্যের ভাব সাত্ত্বিক এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ সঞ্চালনে পরিপূর্ণ যাহা কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ।

(৩) ইহাতে কাল্পনিক ভাবের অভিব্যক্তি থাকে যাহা সাধারণ এর মনে ছুঁয়াচ লাগে। অঙ্গ ও উপাঙ্গ সঞ্চালনে লচকি থাকে।

(৪) এই নৃত্যে স্বর ও তাল প্রধান। ইহা বহুমুখী ভাব ও রসে পূর্ণ। ইহা ভক্তি, করুণ ও রৌদ্র রস প্রধান নৃত্য।

(৪) ইহাতে স্বর ও তালের চেয়ে ভাব ও রসের প্রাধান্য বেশী।

(৫) বৈদিক কালেই লুপ্ত প্রায় এই নৃত্য যাহা কঠিন নিয়মকষণে বদ্ধ ছিল তাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত নয়।

(৫) ইহা লোকপ্রিয় নৃত্য। কঠোরতা মুক্ত এবং ভাব রস প্রধান হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসছে এবং বর্ত্তমানেও ইহার প্রচার আছে।

(৬) মার্গীনৃত্যের বেশভূষা, রূপসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ, ইত্যাদির প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই।

(৬) এই নৃত্যের বেশভূষা, রূপসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ, ধ্বনি-যন্ত্র, পার্শ্ব-সঙ্গীত প্রভৃতির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

(৭) মার্গী নৃত্যে বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী, ডমরু, দুঁদভী, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য ছিল।

(৭) ইহাতে মৃদঙ্গ, বীণা, সেতার সারেঙ্গী, তবলা, বংশী, ঢোলক, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্য এবং বর্তমানে বিদেশী বাদ্যও বাজানো হয়।

রঙ্গমঞ্চ

যে আবদ্ধ স্থানে বসিয়া শ্রোতা দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে কলার রস উপলব্ধি করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন সেই স্থানটিকে বলা হয় "প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গালয়" এবং ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত যে নির্দ্দিষ্ট মঞ্চটির উপর কলা প্রদর্শিত হয় সেইটিকে বলা হয় "রঙ্গমঞ্চ"।

নাট্যশাস্ত্রে আয়তনের তারতাম্য অনুসারে মোট তিনরকম নাট্যমণ্ডপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা (১) বিকৃষ্ট, (২) চতুরস্র (৩) ত্র্যস্র।

উপরোক্ত তিনটিকে আবার জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর এই তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—বিকৃষ্ট জ্যেষ্ঠ, বিকৃষ্টমধ্য ও বিকৃষ্টাবর। অনুরূপ ভাবে চতুরস্র ও ত্র্যস্রকেও ভাগ করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষের উপযোগী ছিল মধ্য প্রেক্ষাগৃহ। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলিয়াছেন, মধ্যমশ্রেণীর (৬২ X ৩২ বর্গহাত) প্রেক্ষাগৃহই উত্তম।

ভিত্তিস্থাপন—প্রথমে সমান দুইটি ভাগে ভূমিকে বিভক্ত করা হইত। অর্থাৎ প্রতি ভাগ ৩২ X ৩২ বর্গহাত করিয়া বিভক্ত করা হইত। অর্ধেক দর্শকবৃন্দের জন্য এবং বাকি অর্ধেক ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত —'রঙ্গপীঠ', 'রঙ্গশীর্ষ' ও 'নেপথ্যগৃহ' প্রভৃতির জন্য এইগুলি যথাক্রমে ৩২ X ৮ বর্গহাত, ৩২ X ৮ বর্গহাত এবং ৬২ X ১৬ বর্গহাত এইরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইত।

'রঙ্গপীঠ' হইতেছে মূল প্রদর্শনী মঞ্চ। রঙ্গশীর্ষের উভয়পার্শ্বে থাকিত '**মত্তবারণী**' (wings) এবং পিছন দিকে থাকিত '**নেপথ্য গৃহ**' (Green room)।

সুন্দর, সুব্যাবস্থাপনায় পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা আজও কমে নাই বরঞ্চ উত্তরোত্তর ইহার আকর্ষণ এবং প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে।

রূপসজ্জা

"সঙ্গীত রত্নাকরে" পাত্রের রূপসজ্জা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিম্নরূপ পুষ্পশোভিত, সুনীল, স্নিগ্ধ, বিস্তীর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত ভাবে সন্নিবেশিত থাকিবে। অলকা-তিলকা অঙ্কিত ভালে অলক-গুচ্ছ শোভা পাইবে। নয়নে অঞ্জনরেখা এবং কর্ণমূলে বলয়ের আকারে তাল পত্রে নির্মিত উজ্জ্বল কর্ণভূষণ থাকিবে। দন্তপংক্তির

প্রভাজালে রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কপোলে কস্তুরীচিত্রিত পত্রভঙ্গরেখা, কণ্ঠে তারাহারাবলী এবং স্থূল মুক্তাহারে স্তনযুগল বেষ্টিত থাকিবে। প্রকোষ্ঠ যুগলে রত্নখচিত সুবর্ণবলয়, অঙ্গুলি সমূহে মণি, নীলা, হীরাদিখচিত অঙ্গুরীয় থাকিবে। অঙ্গে ক্ষীরের ন্যায় শুভ্র দুকূল কুর্পাসবস্ত্র থাকিবে। দেশের প্রথানুসারে কঞ্চুকও (লম্বাহাত ওয়ালা জামা) ব্যবহার করা যাইতে পারে। শ্যাম ও গৌরকান্তি পাত্রের পক্ষে এই জাতীয় মণ্ডন যথোচিত বিধেয়।

বেশভূষা, রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা

প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন নৃত্য শৈলীতে যে সকল রূপসজ্জার প্রচলন আছে, তাহা বর্তমান কালে যথাযথ অনুসরণ করা হয় না। ইহা যুগ, কাল ও দেশ ভেদে পৃথক্ পৃথক রূপ লইয়াছে। বেশভূষা, রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির দ্বারা নৃত্য এবং অভিনয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যুগ, কাল এবং দেশাচার প্রভৃতির প্রকাশ পায়। জগৎ গতিশীল। তাই গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করিতে হইবে। বেশভূষা, রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা যুগোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বসন-ভূষণ দেহরেখার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; তাহাই নৃত্যের উপযোগী। অধিক ভূষণে সজ্জিত হওয়া উচিত নয় কারণ তাহাতে ঘর্মের দরুণ মুখ কান্তি নষ্ট হইতে পারে। ওষ্ঠ রঞ্জন এবং চক্ষু রঞ্জন ছিল অবশ্য করণীয়।

একটি সফল প্রদর্শনীর জন্য শিক্ষা এবং অভ্যাসের যেরূপ প্রয়োজন, বেশভূষা ও রূপসজ্জার প্রয়োজনও ঠিক ততখানিই। কোন চরিত্রকে দর্শকের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে বেশভূষা ও রূপসজ্জা সেই চরিত্রানুগ হওয়া প্রয়োজন। খুব সতর্কতা সহযোগে বেশভূষা এবং রূপসজ্জার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন। এমন জমকালো পোষাক পরিধান করা উচিত নয়, যাহা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও প্রদর্শন কৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বেশভূষা ও রূপসজ্জা দর্শকদের চিত্তাকর্ষণের পক্ষে খুবই সহায়ক। বেশভূষা যাহাতে নৃত্য প্রদর্শনের সময় কোনরূপ ব্যাঘাত বা অসুবিধা না ঘটায়, সেইজন্য বেশ আঁট-সাঁট সম্বন্ধেও সচেতন হইতে হইবে। যেমন তেমন ভাবে পাউডার ও রুজ এবং চোখের পাতায় নীলরঙের প্রলেপ দিলেই দেখিতে ভাল লাগে না, সেইগুলি পরিমিত ভাবে ব্যবহার করা দরকার কারণ সুন্দর বেশভূষা এবং রূপসজ্জা করাও একটি art।

ইহা ছাড়া আলোক সম্পাত ও নেপথ্য সঙ্গীত-দ্বারা নৃত্যের যথার্থ পরিবেশ রচনা করা সম্ভব; যাহা শিল্পীর mood আনিতে সহায়তা করে এবং দর্শকের মনে একাগ্রতা ও অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সাহায্য করে। মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটও নৃত্যের অনুকূল পরিবেশ রচনাতে সহায়তা করে। মঞ্চ যাহাতে দৃঢ় হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বর্তমানকালে ভারতীয় নৃত্যের চারটি ধারা বা আঙ্গিক

ভারতীয় নৃত্য প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত :—দেশী (বর্তমান কালে ইহাকে মার্গ নৃত্য বলা হয়) ও লোক নৃত্য।

দেশী নৃত্য বা মার্গ নৃত্য :—ভারতীয় মার্গ নৃত্যে চারটি ধারা বা আঙ্গিক আছে; যথা—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। ভরতনাট্যম্ ও কথাকলি হইতেছে দক্ষিণ ভারতের নৃত্য। কথক হইতেছে উত্তর ভারতের নৃত্য এবং মণিপুরী হইতেছে ভারতের পূর্বাঞ্চলের নৃত্য।

(১) ভরতনাট্যম, ভারতীয় মার্গনৃত্যের সর্বাপেক্ষা নয়নবিমোহন ধারা। ইহার আঙ্গিক সৌকর্য অবিস্মরণীয়। ইহাতে সর্বাঙ্গের মনোগ্রাহী সঞ্চালন ব্যতীত অভিনয়াংশও লক্ষণীয়।

(২) কথাকলি নৃত্য ধারার প্রধান উপজীব্য বীররস। ইহাতেও ভারতীয় পুরাণের কাহিনীগুলি রূপ গ্রহণ করে। ইহাতে পদবিক্ষেপ

এবং অন্যান্য অঙ্গের কারুকাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার রূপসজ্জাও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(৩) কথক নৃত্য পায়ের কাজের প্রাধান্য লক্ষণীয়। ইহাতে বোল এবং অভিনয়ের সাহায্যে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করা হয়।

(৪) মণিপুরী—অত্যন্ত কোমলতাপূর্ণ, লালিত্যপূর্ণ, নয়ন তৃপ্তি-কারী নৃত্যধারা। ইহার প্রধান উপজীব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সমূহ।

শিল্পী—অনুপশঙ্কর

নৃত্যাচার্য মণিশঙ্কর

নৃত্য শিল্পী সুখেন বড়ুয়া

(কয়েকটি নৃত্যশিক্ষায়তনে শিক্ষকতা কার্যে ব্রত আছেন)

ভরতনাট্যম ন‌ৃত্যের ইতিহাসের পশ্চাদপট
(Historical Back ground of Bharatnatyam)

কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত যে ভারতীয় সংগীত সংস্কৃতির বিস্তার ছিল, বর্তমানের ভরতনাট্যম নৃত্য কলা তারই এক প্রবীণ অঙ্গ। বৈদেশিক আক্রমণে এবং তার শাসনে প্রভাবিত হয়ে ভারতের উত্তর ভাগে ঐ সঙ্গীত সংস্কৃতি এক মিশ্র সংস্কৃতির রূপধারণ করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত বিদেশী আক্রমণের কবলমুক্ত থাকায় সেখানে ঐ প্রভাব অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তার ফলে সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট বজায় ছিল এবং আজও আছে। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের দেবদেউল সমূহে পবিত্র ভাবে ভারতীয় মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঐ নৃত্যক'লা প্রদর্শিত হওয়ার কারণেও তার যথার্থ সংরক্ষণ করণ সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী কালে সেখানকার সঙ্গীত পিপাসু রাজন্যবর্গের ও গুণীজনের আন্তরিক সহায়তার ফলে ঐ ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ লাভ করে ভারতের সমগ্র অঞ্চলে বিস্তার লাভের পথে। শুধু তাই নয় ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলা সংস্কৃতি যে কেবল দক্ষিণ ভারতে সীমিত ছিল তা নয়, উত্তর ভারতেও তা সংরক্ষিত ছিল এমন নজিরও পাওয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, মহাকবি কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনী নগরে কাশ্মীরের এক পণ্ডিতজন অভিনব গুপ্তের নাম পাওয়া যায়, যিনি ভরতনাটাম্ শাস্ত্রের ওপর তাঁর সুচিন্তিত টীকা রচনা করে আলোক সম্পাত করে গেছেন। বঙ্গভূমিতে কবি জয়দেবের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত "অষ্টপদী" এবং তাঁর পত্নী পদ্মাবতী বিরচিত "অভিনয়" মধ্যকালীন গুপ্তযুগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এছাড়া পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই সংস্কৃতি সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল।

উত্তর ভারতে প্রায়শঃ বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারা বৈদেশিক প্রভাবের

সঙ্গে মিশে যায় এবং একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, ফলে ভারতীয় নৃত্যকলা ঐ মিশ্র সংস্কৃতির মাঝে তার আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ পোষকতাই প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বৈদেশিক সংগীত সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কালক্রমে তার নিজের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে। দক্ষিণ ভারতে (মাদ্রাজ মহীশূর, কর্ণাটক অন্ধ্র প্রভৃতি) প্রচলিত কর্ণাটকী সংগীত সেইরূপভাবে প্রভাবিত না হওয়ায় এখনো প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বজায় রেখে আসছে নির্ভেজাল ভাবে।

ভরতনাট্যম

ভরতনাট্যম্—ভরতনাট্যম ধ্রুব বা ক্লাসিকাল নৃত্যেব মূলরীতি। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে ইহাতে ভাব-রস তালের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'ভরতনাট্যম হইয়াছে। (ভিন্ন মতে ভাব—ভ, রাগ—র এবং তাল—ত এই তিনটি প্রথম বর্ণের সমন্বয়ে এর নাম হয়েছে ভরতনাট্যম্)। প্রধানতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া এই ধ্রুব নাট্যরীতির বিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'ভরতনাট্যম' বলে;—এবং সেইখানেই ইহার এইরূপ নামকরণের সার্থকতা। ইহাকে প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্যের মর্যাদা দেয়া হয়। শাস্ত্রে যে 'করণ' অঙ্গহারেব উল্লেখ আছে, তাহা শুধুমাত্র ভরতনাট্যমেই দেখা যায়।

ভক্তিযুগে যে সকল নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ মেলা', 'শিবমেলা', 'নট্টুভমেলা', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাটকই পরবর্তীকালে পৃথক পৃথক নাম লইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে 'ভাগবত মেলা', 'কুচিপদী', 'যক্ষগণ', প্রভৃতি প্রাচীন নৃত্যনাট্যগুলির পরিণত অবস্থা। এই সকল নৃত্যনাট্যগুলির প্রবর্তকগণ ভ্রাম্যমান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা

একাধারে কবি, নৃত্যজ্ঞ ও নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নৃত্যনাট্যগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। নট্টুভনর ও সঙ্গীতাচার্যগণ দেবদাসীগণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কুচ্চিপদী নৃত্যনাট্যের ভিতর 'পারিজাতহরণ'. বা 'ভামকালপম্' বিশেষভাবে খ্যাত। তিন রাত্রি ধরিয়া এই সকল নৃত্যনাট্যের আয়োজন হইত তীর্থ নারায়ণ যোগী 'রুকমঙ্গদ' নৃত্যনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।

ভরতনাট্যম্ বলিতে শুধু 'দাসীঅট্টম্' নহে। কুচ্চিপদী ও কুরুভঞ্জী নৃত্যনাট্যকেও গণ্য করা হয়। 'দাসীঅট্টম্' অন্যান্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—'চিন্নমেলম্' 'সাদীরনৃত্য' 'তাঞ্জোর'নৃত্য প্রভৃতি।

সারফোজী (১৭৪৭-১৮২৪ খৃঃ পর্য্যন্ত) ও শিবাজীর রাজত্বকালে (১৮২৪-১৮৭৫ খঃ পর্যন্ত) সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। ইহাদের রাজত্বকালে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া ভেডিভেলু এবং শিবানন্দম আধুনিক ভরতনাট্যম নৃত্যের সংস্কার করেন।

সর্বাপেক্ষা প্রথমে ভরতনাট্যমের চর্চা হইত তাঞ্জোরে। কাজেই তাঞ্জোরের নৃত্যে মূলরীতির বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঞ্জোরের মহারাজা এই লুপ্তপ্রায় নৃত্যধারার পুনরুদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের দেবদাসীরাই এই ধারাকে বহন করিয়া আসিয়াছে যুগ হইতে যুগান্তরে। মন্দিরের বিগ্রহের সম্মুখে আরতির সময়ে দেবদাসীরা এই নৃত্য করিত—দেবতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। প্রথম যুগে সমাজে দেবদাসীদের স্থান অত্যন্ত সম্মানীয় ছিল। দেবদাসীরা দেবতাতেই সমর্পিত প্রাণ হইয়া, দেবতাকেই স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়া সারা জীবন কুমারী থাকিয়া দেবদেউলে দেবসেবা করিত। পরবর্তী যুগে এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন অনুপ্রবেশ করিল তখন বিভিন্নপ্রকার অবস্থার বিপাকে পড়িয়া দেব দেউলের পরিবর্তে রাজা-মহারাজা বা বিত্তশালী ব্যক্তির বিলাসকক্ষই হইল দেবদাসীদের নৃত্যের স্থান, বিগ্রহের

বনিক শ্রেণীর মনোরঞ্জনই তাহাদের কর্তব্যকর্ম হইল। তখন সমাজ তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া রাখিল। তাহাদের ঐরূপ জঘন্য বৃত্তির সহায়ক বলিয়া জনসাধারণ ঘৃণায় 'ভরতনাট্যম' নৃত্যধারাটিও চর্চা করিত না, ফলে এই ধারাটি অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। এখন কালের পরিবর্তনে, মানুষের মনের উদারতায়, এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে এই নৃত্যধারা পুনরায় সমাদৃত ও সমধিক প্রচলিত হইয়াছে।

'সাদীর' কথাটী "চতুর" কথাটির অপভ্রংশ। চারিটি বেদ হইতে ইহার সারাংশ সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে "চতুর" বা "সাদীর" নাট্য বলা হইয়া থাকে। "চতুর" কথাটির "নিপুণ" অর্থও করা যায়। নট্টুভমেলা হইতে 'সাদীর' নৃত্যের উদ্ভব। ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে সাদীর নাট্যম্‌ও বলা হয়।

ভরতনাট্যম নৃত্যের গায়িকা বৃন্দকে "পদিনী" বলা হয়। ভরতনাট্যম শিখিতে হইলে প্রথমেই "আদাউ-এর" (Basic Dance units of Bharatnatyam) অভ্যাস করিতে হয়—ইহাতে নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, স্থানক, চারী, নৃত্য, রেখা ও সৌষ্ঠবের সমন্বয় হইয়া থাকে; ইহা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিলে নৃত্যের পরবর্তী অংশগুলি শিখিবার পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

ভরতনাট্যম নৃত্য পদ্ধতিতে পদতল সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে স্থাপনকে "টাট" বলে। ভূমিতে গোড়ালীর দ্বারা আঘাত করাকে "টাটমেট" বলা হয়। পর্যায়ক্রমে পদতল ও গোড়ালীর দ্বারা আঘাত করাকে 'টাটমেট বলা হয়। নৃত্যে "তেইউমদত্তা" বোলটি "টাটমেট"-এর সাহায্যে করিতে হয়। পদতলের অগ্রভাগ দ্বারা লাফাইয়া গোড়ালীর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলে "কুদিত্তিমেট্টি" হয়। এই ধরণের পদক্রিয়ার দ্বারা "তেইকৎতেই" করিতে হয়। পদতলের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে "নাট" হয়। ভরত নাট্যম্ নৃত্যে ছোট বোলকে "জেদী" বলা হয়। কতকগুলি জেদীর সমষ্টিকে

অথবা বৃহৎ বোলকে "তিরমন্নম্" বলা হইয়া থাকে। 'শিলপ্পদিকরণ —ইহা একটি তামিল গ্রন্থ।

নটনাদী বাদ্যরঞ্জনম্—ইহা একটি তামিল ভাষার সংগীত গ্রন্থ। ইহাতে ১২ প্রকার তাণ্ডবের উল্লেখ আছে। যেমন,

(১) আনন্দ তাণ্ডব (২) সন্ধ্যা তাণ্ডব, (৩) শৃঙ্গার তাণ্ডব (৪) উমা তাণ্ডব (৫) ঊর্ধ্ব তাণ্ডব (৬) মুনি তাণ্ডব (৭) সংহার তাণ্ডব (৮) উগ্র তাণ্ডব (৯) ভূত তাণ্ডব (১০) প্রলয় তাণ্ডব (১১) ভুজঙ্গ তাণ্ডব (১২) শুদ্ধ তাণ্ডব।

আরাঙ্গাট্রেল—সাত বৎসর পর শিক্ষা সমাপনান্তে দেবতার সম্মুখে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদর্শিত প্রথম নৃত্যোৎসব।

ভরতনাট্যম্ (সাদীর) নৃত্যের ছয়টি বিভাগ আছে—আলারিপ্পু, যতিস্বরম্, শব্দম, পদম্, বর্ণম্ ও তিল্লানা।

(ক) **আল্লারিপু**—ইহার অর্থ "বন্দনা"। প্রথমে ভূমি দেবীকে (রঙ্গদেবতাকে) প্রণাম ও দর্শক মণ্ডলীকে অভিবাদন করিয়া শিল্পী মস্তক' ভ্রূ, চোখ, গ্রীবা, স্কন্ধ ইত্যাদির এবং "আদাউর" সাহায্যে আপনার নৃত্যকুশলতা এবং শিল্পসৌকর্য্যকে বিকশিত করিয়া তোলে। ইহা দ্বারা ভরতনাট্যম্ নৃত্য আরম্ভ করা হয়।

(খ) **যতিস্বরম্**—ইহাতে 'যতি' ও 'রাগ'-এর সমন্বয় হয়। 'যতি'র অর্থ 'বোলপরম্' "স্বরম্"-এর অর্থ 'সরগম্'। এই নৃত্যে বিশেষ তালের, ছন্দের সহিত যতপ্রকার সম্ভব অঙ্গহারের সমন্বয়। করা হয়। 'যতি'র সহিত 'সারগমে'র গ্রন্থণ হয় বলিয়া ইহাকে 'যতিস্বরম্' বলা হয়।

(গ) **শব্দম্**—এই নৃত্যেই প্রথম অভিনয়ের রস আস্বাদন করা যায়। ইহাতে সুন্দর সুন্দর গীতের সাহায্যে অভিনয় প্রদর্শন করা হয়। শব্দম এ দেবতা ও রাজার স্তুতিগান করা হয়। এই নৃত্যে একই অর্থবাহী বোলকে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করা হয়।

(ঘ) পদম্—এই নৃত্যে সঙ্গীত ও বোল দুই-ই থাকে। ভরত-নাট্যম্ নৃত্যের শেষ অংশে ইহা প্রদর্শিত হয়। 'পদম্'-এ যে সঙ্গীত হয় তাহা অধিকাংশই প্রেম সঙ্গীত।

(ঙ) বর্ণম্—ইহা খুব জটীল ও বড় নৃত্য। এই নৃত্যে গানের কথার সহিত কঠিন তাল-লয়ের কাজ বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহায্যে করা হয়। মধ্যে মধ্যে বোল পরম্ ও সারগম্-এর সহিত নৃত্য করা হয়। পদদ্বয়ের দ্বারা তালের কাজ, হস্তমুদ্রা দ্বারা সঙ্গীতের অর্থ প্রকাশ ও মুখমণ্ডলের দ্বারা অভিনয় করা হয়। শিল্পীর চাতুর্য, প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ইহাতে।

(চ) তিল্লানা—এই নৃত্যে পায়ের 'কাজ' খুব বেশী এবং এই নৃত্য সাধারণতঃ দ্রুতলয়ে হইয়া থাকে। এই নৃত্যে তিল্লানা গীত হয় বলিয়া ইহাকে 'তিল্লানা' বলে। ইহাতে গানের সহিত ছন্দের বৈচিত্র্য একটি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যের বেশ—জগত গতিশীলতাই ইহার ধর্ম, গতিই ইহার প্রাণ। গতির সহিত আমাদের সামঞ্জস্য রাখিতেই হইবে। সুতরাং যে পরিচ্ছদ সাধারণ উপায়ে পরিধান করিতে পারা যায় এবং যাহা দেহরেখার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে, তাহাই নৃত্যের উপযোগী। দেহের গতি প্রকৃতির সহিত পোষাকের সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। সুতরাং আধুনিক যুগে ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নৃত্যের বেশভূষা করা উচিত। নাট্য-কারিণীর অধিক ভূষণে সজ্জিত হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে অধিক ঘর্মের জন্য মুখকান্তি নষ্ট হইতে পারে এবং ইহা দেহের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতে পারে। এই সম্বন্ধে বিচার করিয়া নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ হওয়া উচিত।

আধুনিক ভরতনাট্যম্ নৃত্যে পোষাক পরিচ্ছদের সংস্কার করা হইয়াছে।

ভরতনাট্যম্ নৃত্য বিদ্যুতের ন্যায় গতিসম্পন্ন বলিয়া ইহাতে

পায়জামার মতো পোষাক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পূর্বে পায়জামা ছিল না। তাহার পরিবর্তে কচ্ছ দিয়া শাড়ী পরিতে হইত। এই শাড়িগুলি ডোরাকাটা ছিল এবং ইহাকে "তুইয়াশেলে" বলা হইত। অধুনা একটি পৃথক কাপড়ের টুকরা পশ্চাদ্‌ভাগে বিস্তৃত করিয়া এবং নিতম্ব ঢাকিয়া কোমরে বাঁধিতে হয়। পূর্বে তুইয়াশেলের অঞ্চলটি কোমরে জড়াইয়া সামনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। ভরতনাট্যম্‌-এ নীবিবন্ধ ব্যবহার করা হয় এবং ইহাকে 'মুন্দি' বলা হয়। স্কন্ধের উত্তরীয়কে বলা হয় 'মেলাকু'। 'চুম্‌কীর কাজকরা ব্লাউজকে বলা হয় "রবিকে" এবং চুম্‌কীর কাজকে বলা হয় "কর্চিপ"।

নৃত্যশিল্পী একটি সর্পিল বেণী প্রলম্বিত করেন, যাহাতে ফুলের মালা ঝোলানো থাকে। অলংকারের ভিতর সীমন্তের দুই পার্শ্বে দুইটি ব্রোচ ব্যবহার করা হয়। এই দুইটি ব্রোচ হইতেছে 'চন্দ্র' ও সূর্য্য'। সিঁথি ও তার সামনের লকেটটির নাম 'চুট্টি'। ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে সিঁথিকে এবং দুই পার্শ্বে দুইটি ব্রোচকে 'তালেকনাঘাই' বলা হয়। বেণীর উপরদিকে একটি রঙিন পাথর খচিত বড় একটি গোল ব্রোচ থাকে। ইহাকে 'রাকুডি' বলে। বেণীর মধ্যে মধ্যে এক একটি পাথর খচিত ব্রোচ থাকে। ইহাকে 'জডাইভিল্লা' বলা হয়। বেণার প্রান্তে সুন্দর তিনটি ঝুমকার গুচ্ছ থাকে, ইহাকে 'কুঞ্জম্‌ বলে। মণিবন্ধে বলয় এবং হাতের উপর প্রান্তে বাজুবন্ধকে 'ওয়াঙ্কি" বলা হয়। কানের ঝুমকাতে যে শিকলটি চুলের সঙ্গে লাগানো হয়, তাহাকে "মাটল" বলে। "তোড" হইতেছে কর্ণভূষণের উপরপ্রান্তে ব্যবহৃত পাথর। লম্বমান ঝুমকাকে "ঝিমকি" বলা হয়। ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে নাকের গহনাগুলি একটি বিশেষত্ব আনিয়া দেয়। ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে 'নথ', "বেশরী" ও "পুল্লাকে" (নোলক) প্রভৃতি নাকের গহনা ব্যবহার করা হয়। পায়ে চুটকী, তোড়া ইত্যাদী গহনা এই নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। নৃত্যের সহিত সঙ্গতে থাকে বীণা, নাগশরম্‌, বাঁশী, মাদল ও মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। এই নৃত্যের বিখ্যাত শিল্পী—

মিনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাই, রামচন্দ্র পিল্লাই, রামাইয়া পিল্লাই, এলাইয়া পিল্লাই, গণেশম্ পিল্লাই, ও মরুথাপ্পা পিল্লাই প্রমুখ।

দেবদাসী

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত পূজার উপচার হিসাবে দেবতার চরণে নিবেদিত হইত। যাঁহারা দেবতার পাদপদ্মে নিবেদিত সঙ্গীতে অধিকারিণী হইতেন, তাঁহাদিগকে দেবতার চরণের চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করা হ'তো, তাঁদেরই দেবদাসী বলিয়া অভিহিত করা হ'তো। দেবদাসীর প্রথা শুধু ভারতে নহে, এশিয়া এবং ইউরোপেও প্রচলিত ছিল। রুবি গিনার (Ruby Ginner) তাহার "The Gateway to the Dance" এ গ্রীক্ দেবদাসী গণের কথা উল্লেখ করেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার দেবদাসীগণকে "মাহারী" বলা হ'তো। মাহারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন ভিতরগণি ও বাহারগণি। ভিতরগণি বড় দেউলে নৃত্য করিতেন এবং বাহারগণি মন্দিরের সংলগ্ন নাট মন্দিরে নৃত্য করিতেন। ইহাদের অস্তিত্ব এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মণিপুরে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল এবং এখন পর্য্যন্ত আছে। মণিপুরের মন্দিরে দেবদাসী ও দেবদাস উভয়ই ভগবানের সেবা করিতে পারিতেন, ইহাদিগকে এ্যামাইবী ও এ্যামাইবা বলা হয়। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীগণের ভিতরও শ্রেণী বিভাগ ছিল। ইহারা 'দেবদাসী', 'রাজদাসী', অলঙ্কারদাসী বা স্বদাসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ভরত নাট্যম নৃত্য চিরদিনই ভারতীয় সংগীতের আদর্শের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে এসেছে। এই নৃত্য যখন দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে তখন দেবদাসীগণের নিষ্ঠার দরুণ ইহাতে কোন প্রকার বিদেশী প্রভাব প্রবেশ করতে পারেনি। তখন থেকেই এই নৃত্য তাদের মধ্যে পরম্পরায় চলে এসেছে।

দেবদাসী—দেব মন্দিরে দেবতার মনোরঞ্জন করতেন তাকে "দেবদাসী" বলা হ'তো।

রাজদাসী—যিনি রাজ দরবারে নৃত্য প্রদর্শন করতেন তাকে "রাজদাসী" বলা হ'তো।

অলঙ্কারদাসী—যারা বিবাহ বা সামাজিক উৎসবে নৃত্য প্রদর্শন করতেন তাদের "অলঙ্কার দাসী বা স্বদাসী বলা হ'তো।

ভরত নাট্যম্ নৃত্যের গুরুদের বংশ তালিকা

ভরত নাট্যম্ নৃত্য গুরুদেব বংশ তালিকা নির্ণয় করা খুব সহজ কাজ নয়। তবুও ভরত নাট্যম্ নৃত্যের কিছু কিছু গুরু ও তাঁদের বংশ তালিকা ও পরিচয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সুব্বারাও ছিলেন সারফৌজীর সমসাময়িক। তাঁর চার পুত্র ছিল। তাঁদের নাম যথাক্রমে চিন্নায়িয়া, পুন্নায়িয়া, ভেদিভেলু ও শিবানন্দম্। তাঁদের বংশ তালিকা থেকে দেখা যায় যে সুব্বারয়া নট্টুভনর তুতাযাজী রাজ প্রসাদের সম্মানিত নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তাঁরই চারপুত্র তানজোর রাজ সভায় ছিলেন এবং তাদের নৃত্য কুশলী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েছিলেন। আধুনিক ভরত নাট্যম্ নৃত্য-এর সংস্কার এদের দ্বারাই সাধিত হয়। এই সময় নৃত্যের বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এর পরই নাম করা যায় মিনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাইয়ের। উপরোক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের এক জন, পুন্নাইয়ার কন্যার পুত্র-এর পুত্র হলেন, এই মিনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাই। যাঁহাকে পাশ্চাত্য ব্যালে (Ballet) নৃত্যের শিল্পীদ্বয় সিচেট্টা (Cichette) ও পেটিপ্পা (Pettippa) এর সংগে তুলনা করা যেতে পারে। এইটাই প্রথমে মনে জাগে যে, তাঁর বংশকে একটা শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত এক বিশাল বট গাছের মত মনে হয়। যিনি তাঁর বংশে বহু নৃত্যশিল্পী সৃষ্টি করে গেছেন। বংশ তালিকা দেখলে দেখা যাবে এই বংশের

পূর্ব পুরুষ সুব্বারয়া নট্টুভনর অপর নৃত্যশিল্পী সেনতিলভেল অন্নভীর পুত্র মহাদেব অন্নভীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে তানজোরের রাজসভায় তিন্নেলভেলী থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ভরতনাট্যম-এর রূপ আগে ছিল একটু অন্য প্রকার। মহাদেব অন্নাভি ইহাকে পরিমার্জিত ও নূতন নূতন নৃত্তের ভঙ্গি সংযোজিত করেন। তিনি শিক্ষাগুরু ও রচয়িতা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি "ভরত নাট বিদ্বান" উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন। মিনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাই নৃত্যের ক্রিয়াত্মক ও তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পটু ছিলেন। তাঁর এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তাঁর পুত্র মুথিয়া পিল্লাই ব্যাঙ্গালোরে নৃত্য চর্চা করেন। তাঁর প্রথমা কন্যাকে চুকালিঙ্গম পিল্লাই, দ্বিতীয়াকে তানজোরের পিচাইয়া পিল্লাই এবং তৃতীয়াকে পুন্নাইয়া পিল্লাইয়ের সংগে বিবাহ দেন।

আদাউ

[The basic Dance Units of the Bharat Natyam]

ভরতনাট্যম্ নৃত্যে আদাউ সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব এবং বিভিন্ন মতবাদ চালু আছে। আদাউয়ের সংখ্যা সম্পর্কে ঐ অনুরূপ ব্যাপার। (Adavu consists of 15 groups of families. Each of these groups is again subdivided into 2 or 3 or more different rhythmic syllables and the figures or units of Adavus are performed in accordance to rlythmic syllables or BOLE. There are controversies regarding the total number of figure or units in the entire group or families of Adavus with rhythmic syllables. The number according to some Gurus, (Preceptors) there are seventy six figures and to others opinion it is hundred.) অর্থাৎ আদাউকে

১৫টি পরিবারের মত ধরা হয়েছে। যেমন এক একটি পরিবার দুই বা ততোধিক মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠে তেমনি আদাউয়ের কয়েকটি ছন্দযুক্ত বোল নিয়ে (অর্থাৎ দুই বা তার বেশী) এক একটি আদাউ গঠিত হয়েছে। এই ভাবে মুখ্য আদাউয়ের সমষ্টি ১৫টি। উপরোক্ত ছন্দযুক্ত বোলসহ আদাউযের সংখ্যা নিয়ে কোন কোন গুরুর মতে ৭৬ টি আবার কারো কারো মতে ১০০টি।

আদাউ শব্দের অর্থ হল হস্ত, পদ, ভ্রূ, গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন। ইহা ভরত নাট্যম্ নৃত্যশিক্ষার বর্ণমালা স্বরূপ অর্থাৎ সাধারণ কথায় প্রাথমিক ভিত্তি। নিম্নে ১৫ টি মুখ্য আদাউযের নাম লিখিত হইল।

১। তট্টা (Tatta) আদাউ
২। নট্টা (Natta) আদাউ
৩। তা তেই তেই তা (Ta Tai Tai Ta) আদাউ
৪। কুদিত্তু মেত্তু (Kudittu Mettu) আদাউ
৫। তেইযা তেই (Taiya Taiyi) আদাউ
৬। তৎ তেই তা হা (Tat Tai Ta Ha) আদাউ
৭। তৎ তেই তাম (Tat Tai Tam) আদাউ
৮। তাদিংগিনাতুম (Tadiginatom) আদাউ
৯। কিটাতাকাতারিকিটাতুম (Kitatakatarikitatom) আদাউ
১০। তা তেই দত্তা (Ta Tai Datta) আদাউ
১১। ধিৎতেইনদা তা তেই (Dhitaindatatai) আদাউ
১২। মণ্ডি (Mandi) আদাউ
১৩। সারিরকল (Sarrikal) আদাউ
১৪। তাকিটা (Takita) আদাউ
১৫। তেই তেই তেই তেই তেই তেই দিদিতেই (Tai Tai Tai Tai Tai Tai Dhi Dhi Tai) আদাউ

১। তট্টা আদাউ-এর ছন্দযুক্ত বোল সমূহ নিম্নরূপ—

ক। তেই হা তেই অথবা তেইয়া তেই

খ। তেইহা তেই অথবা তেইয়া তেই

গ। তেইহা তেইহা তেই অথবা তেই তেই তা

ঘ। তেইহা তেইহা তেই তেই তাম অথবা তেইয়া তেইয়া তেই তেই তা।

প্রত্যেকটি মুখ্য আদাউ এই ভাবে বিভিন্ন ছন্দযুক্ত বোলসহ গঠিত হয়েছে। ভরত নাট্যম্ নৃত্য শিক্ষায় আদাউ হল নিপুণতা ও সুপরিপাট্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য্য উপাদান।

কর্ণাটকী তাল

দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক পদ্ধতিতে অতি প্রাচীন কালে ১০৮টি তালের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে ৫৬টি তাল প্রচলিত হয়। বর্তমানে ৫৬টির ভিতর ৭টি মুখ্য তাল এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। ১০৮টি তাল "অষ্টোত্তরশত তালম্", ৫৬ টি 'অপূর্ব তালম্' এবং ৭টি তাল 'সপ্ততালম্' নামে পরিচিত। এই সপ্ততালম্ হইতেছে—ধ্রুবম্, মতম্, রূপকম্ ঝম্পা, ত্রিপুট, অঠ ও একম্ উপরোক্ত তালগুলির মধ্যে চারটির নাম অপভ্রংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে, যথা :— ধ্রুবম-এর অপভ্রংশ হয়েছে 'তুরুবম্', মতম্-এর অপভ্রংশ হয়েছে 'মট্টিয়ম,' ত্রিপুট হয়েছে 'তিরপুডাই', এবং অঠ হয়েছে 'অড্ড'। সাতটি প্রধান তালের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি থাকায় মোট তালের সংখ্যা হয়েছে পঁয়ত্রিশটি। এক একটি তাল যেমন পাঁচটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে মোট পঁয়ত্রিশটি তাল হয়েছে, তেমনি প্রত্যেকটি তালের আবার অঙ্গভেদ আছে। মোট অঙ্গ হল ছয়টি। এই অঙ্গগুলির ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন আছে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের মাত্রা পৃথক পৃথক, যেমন :—

	অঙ্গের নাম	চিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
১।	লঘু (বা লেঘু)	।	৪
২।	দ্রুত	০	২
৩।	অনুদ্রুত (বা বিরাম)	‿	১
৪।	গুরু	S (বা ৪)	৮
৫।	প্লুত	{ (বা ৪।)	১২
৬।	কাক্‌পদ	+ (বা ×)	১৬

বিঃ দ্রঃ ;—লঘু (লেঘু) জাতি অনুযায়ী মাত্রা হবে, কিন্তু দ্রুতম ও অনুদ্রুতমের মাত্রা সর্ব্বদাই দুই ও এক হবে। বর্তনান কালে ভরতনাট্যম্ নৃত্যে উপরোক্ত তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

বিসর্জ্জিতম্

কর্নাটকী পদ্ধতিতে প্রতিটি বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালির আঘাত করার পর, অবশিষ্ট মাত্রাগুলিকে দেখানো হয় এই বিসর্জিতম্ দ্বারা। 'বিসর্জিতম্' ক্রিয়াটিকে আবার তিন রকম ভাবে দেখাবার নিয়ম আছে, যেমন :—

১। 'পতাংক বিসর্জিতম্'-হাত উপর দিকে তুলে মাত্রার হিসেব রাখা হয়।

২। 'সর্পিণীবিসর্জিতম্'—ডান দিকে হাত দুলিয়ে দেখানো হয়।

৩। কৃষয় বিসর্জিতম্'—এতে বাঁ দিকে হাত হেলানো হয়।

এক মাত্রায় বিভাগ অর্থাৎ অনুদ্রুত হ'লে সেখানে 'বিসর্জিতম' থাকে না। শুধুই আঘাত দ্বারা তাল দেখানো হয়। দ্রুত অর্থাৎ দুই মাত্রার বিভাগ হলে ১ মাত্রায় তালি ও ২ মাত্রায় 'বিসর্জিতম' দেখাতে হয়।

MATRAS

In the Karna'tic, the matra's were in the form of letters or aksharas. Akshara Kala, unit-time in music অর্থাৎ কর্ণাটকীযতে 'মাত্রা.' অক্ষর-এর দ্বারা গঠিত। 'অক্ষরকাল' একক পরিমাপ সময়কে অক্ষরকাল বলা হয়।

Aditala, a variety of triputa tala the consisting of a chaturashra laghu and two drutams.

আদিতাল হল ত্রিপুটতালের বৈচিত্র্যের একটি তাল। এই তালের চিহ্ন একটি চতরশ্র লঘু ও দুটি দ্রুতম ধাবা গঠিত। যেমন,

Ioo = 4 + 2 + 2 = 8 akshara kala.

'অলঙ্কার,'-মনের বৈচিত্র্য পূর্ণ গতিশীল অনুভূতির ফলে নৃত্য কলা সৃষ্টি হয়েছে। নৃত্য অর্থাৎ ছন্দোময় ভঙ্গির অনুরূপভাবে তালের আবির্ভাবও ঘটেছিল। সঙ্গীতের দুটি দিক। যথা, আত্মিক (spiritual) ও অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্যমূলক (Aesthetic)। অলঙ্কার বলতে এখানে বিভিন্ন সুক্ষ্ম কারুকলার কথাই বোঝায়। শিল্পী যখন তার অঙ্গপ্রতঙ্গ সুবিন্যস্ত অঙ্গভঙ্গিমার দ্বারা সুক্ষ্ম কারুকলা ফুটিয়ে তোলেন তাহাকে অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্য বলে।

ভরতনাট্যম্-এর তাললিপি

তাল→	ধ্রুবম্	মট্টিয়ম্	রূপকন্	ঝম্প	অড্ড	তিরপুডাই	একম্
মাত্রার চিহ্ন→	IOII	IOI	OI	IUO	IIOO	IOO	I
জাতি |							
চতুরশ্রম্ 4	4+2+4+4 =14	4+2+4 =10	2+4 =6	4+1+2 =7	4+4+2+2 =12	4+2+2 =8	4
তিশ্রম্ 3	3+2+3+3 =11	3+2+3 =8	2+3 =5	3+1+2 =6	3+3+2+2 =10	3+2+2 =7	3
মিশ্রম্ 7	7+2+7+7 =23	7+2+7 =16	2+7 =9	7+1+2 =10	7+7+2+2 =18	7+2+2 =11	7
খণ্ডম্ 5	5+2+5+5 =17	5+2+5 =12	2+5 =7	5+1+2 =8	5+5+2+2 =14	5+2+2 =9	5
সংকীর্ণম্ 9	9+2+9+ =29	9+2+9 =20	2+9 =11	9+1+2 =12	9+9+2+2 =22	9+2+2 =13	9

বোল তাল লিপিতে লিখিবার পদ্ধতি

ঠেকা—তাকাদিমি তাকা তাকাদিমি তাকাদিমি।

উপরোক্ত ঠেকাটি ১৪ মাত্রা। ইহাকে ধ্রুবম্ তালে লিপিবদ্ধ করিলে নিম্নরূপ হবে। যথা,

তাল	জাতি	মাত্রার চিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
ধ্রুবম্	চতুরশ্র	1 | 0 | 1 | 1 |	১৪

মাত্রা | | | | | | | | | | | | | | |

ঠেকা তা কা দি মি তা কা তা কা দি মি তা কা দি মি

ধ্রুবম্	ত্র্যস্র	1 | 0 | 1 | 1 |	১১

মাত্রা | | | | | | | | | | |

ঠেকা তা কি টা তা কা তা কি টা তা কি টা

অর্থাৎ চতুরশ্রে ধ্রুবম মাত্রা হলে ত্র্যস্রে ১১ মাত্রা হবে। জাতি হিসাবে লেঘু বা লঘুর মাত্রা পরিবর্তনে তালের মাত্রা পরিবর্তন হয়।

কুচ্চিপদী নৃত্য

কুচ্চিপদী-নৃত্য—কুচ্চেল পুরম্ নামে এক গ্রাম থেকে এই নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে বলে এই নৃত্যের নাম কুচ্চিপদী। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রামের নাম কুচ্চীপদী বলে অভিহিত হয়।

সিদ্ধেন্দ্র যোগী তাঁর অনুপম কাব্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এবং অতুলনীয় শিল্পী মন দিয়ে এই নৃত্য নাট্য সৃষ্টি করেন। এই নৃত্যই 'কুচ্চিপদী' নামে পরিচিত হল। এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে "পারিজাত হরণ" ও "ভাম্‌কালপম্‌" বিশেষ ভাবে খ্যাত। এই নৃত্যনাট্যে যাতে কোন ব্যাভিচারের সংস্পর্শ না আসে তার জন্য সিদ্ধেন্দ্র যোগী এর মধ্যে নারীজাতির অভিনয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। পুরুষেরাই নারী চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কুচ্চিপদী নৃত্যনাট্যে অভিনেতৃরা নিজেরাই গান ক'রে ও তার সংগে নৃত্য করে।
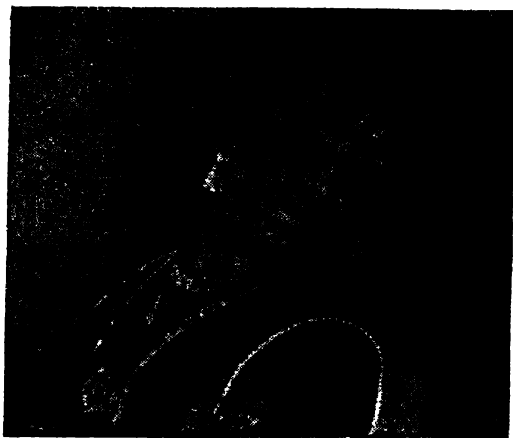
আধুনিক নৃত্যশিল্পী—শ্রীকানাই মজুমদার (সাম্প্রতিক কালে আধুনিক নৃত্য পরিচালনায় ইনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন ও বর্তমানে চিত্র জগৎ-এ নৃত্য পরিচালক)

নৃত্যশিল্পী শ্রীশান্তিনারায়ণ গুপ্ত (ইনি উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ে কিছুদিন ছিলেন এবং ইদানিংকালে কয়েকটি নৃত্যশিক্ষায়তনে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন)।

স্বর্গত: গুরু টি. এন. মরুথাপ্পা পিল্লাই
(রবীন্দ্র ভারতীর ভরতনাট্যম্ নৃত্যের অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গে তাঁকেই
ভরতনাট্যম্-এর প্রচারক এবং প্রচারে তাঁর অবদান অতুলনীয়)

ভরতনাট্যম নৃত্যের একটি মনোরম ভঙ্গিমা
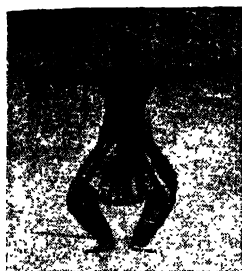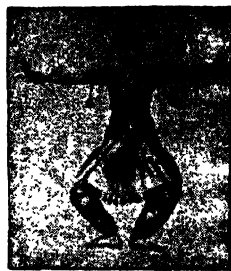
Basic Dance-Units of Adavus.

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
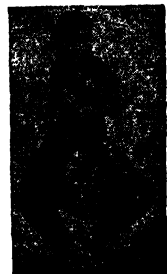
46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100

Pure Dance Poses of Thillana
(তিল্লানা নৃত্তের ভঙ্গীমা সমূহ)
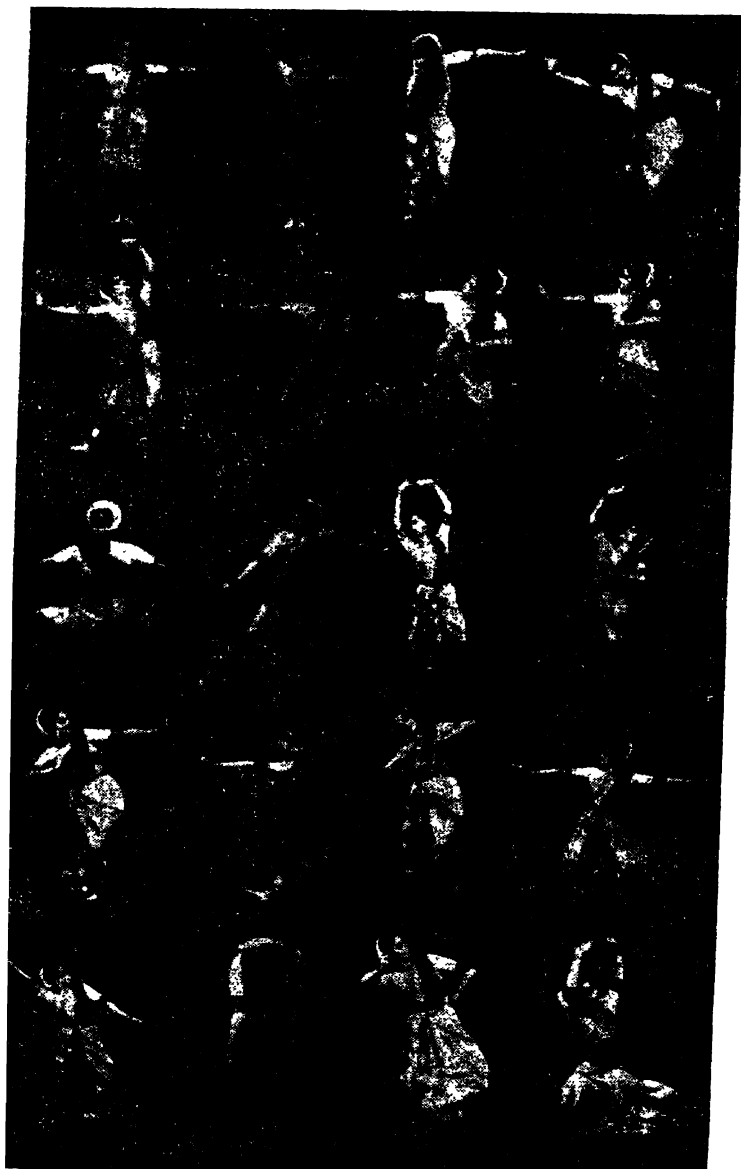
Pure Dance Poses Thillana
(তিল্লানা নৃত্তের ভঙ্গিমা সমূহ)

অভিনয় দর্পণের সংযুত হস্ত মুদ্রাসমূহ
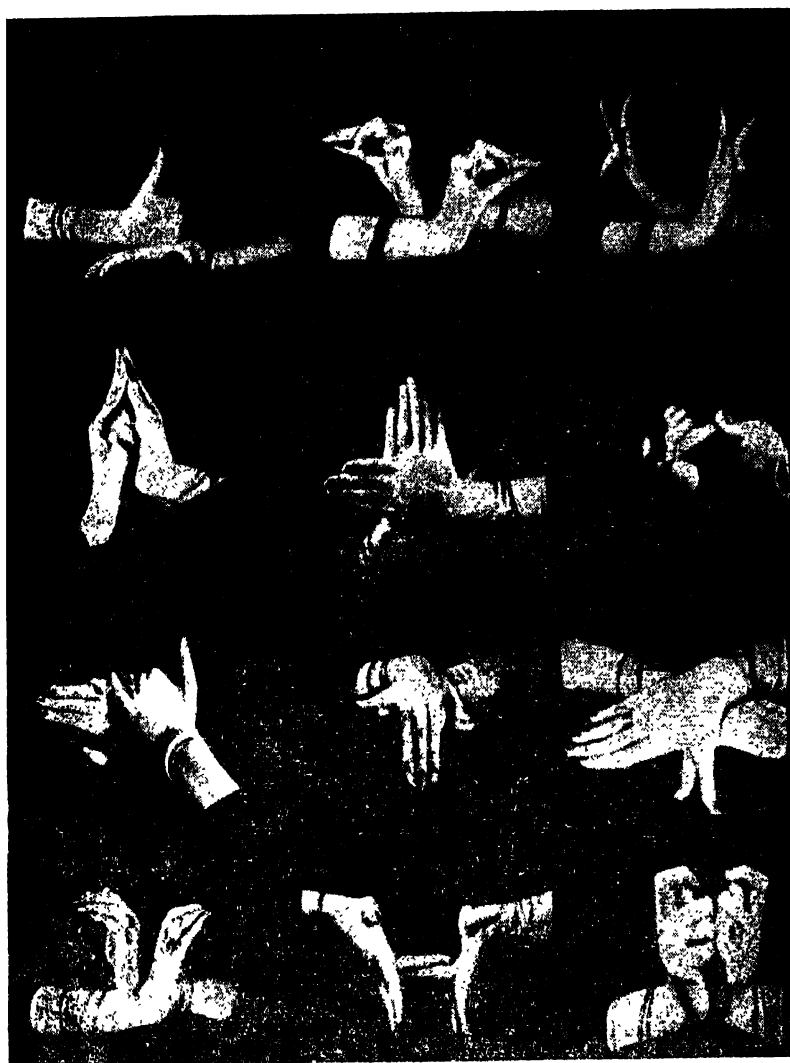
1. শিবলিঙ্গ	2. কটকাবর্ধন	3. কর্তরীস্বস্তিকা
4. শঙ্খ	5, চক্র	6. পাশ
7. কীলক	8. মৎস্য	9. গরুড়
10. নাগবন্ধ	11. খট্টা	12. ভেরুণ্ড।

ওড়িষী নৃত্য

ওড়িষী নৃত্য—উড়িষ্যার দেবদাসীদের মধ্যে এই নৃত্য প্রচা- ছিল। বিশেষজ্ঞরা এই নৃত্যকে খুব প্রাচীন বলে মনে করেন। উড়িষ্যার রাজারা এক সময়ে "মাহারী" দের নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে খারবেলের সময় থেকে ষোড়শ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত "মাহারী" দের নৃত্যের প্রচলন ছিল। তারপর উড়িষ্যায় নৃত্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। গত কয়েক বছর ধরে এই ওড়িষী নৃত্যের পুনর্জাগরণ ঘটেছে। ভরত নাট্যম ও কুচিপদী নৃত্যদ্বয়ের সংগে এই নৃত্যের গভীর সাদৃশ্য দেখা যায়। ওড়িষী নৃত্যের সংগীত উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি অনুসরণ করে। ওড়িষী নৃত্য কতগুলি বিশেষ শাস্ত্রকে অনুসরণ করে, যেমন, নাট্য মনোরমা, সংগীত নারায়ণ, সংগীত দামোদর, সংগীত কল্পলতা, সংগীত অভিনয় দর্পণ, এবং গীত প্রকাশ। বর্ত্তমানে এই নৃত্য উচ্চাংগ পর্য্যায়ে উন্নীত হতে প্রয়াসী হয়েছে। এই নৃত্য ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয় নি।

কথাকলি

(২) **কথাকলি**—কথাকলিও দক্ষিণ ভারতের নৃত্য। কেরালা হইতেছে কথাকলির মূল পীঠস্থান। সুদূর দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে কেরলের ভৌগলিক অবস্থান কথাকলি নৃত্যরীতির বিশুদ্ধতা বহুকাল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কথাকলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কেরল অঞ্চলের লোকপ্রবাদ হইল—ষোড়শ শতাব্দীতে মালাবার রাজ্যের মহারাজা বীর কেরালা বর্মা এই নৃত্যরীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের দেবালয়ে দীর্ঘকাল হইতে দেবদাসী নৃত্যের প্রচলন ছিল। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন পালা-পার্বণে লোকনৃত্য ও লোক-সংগীতেরও বহুল প্রচলন ছিল। এই সকল লোকনৃত্যের ধারা কথাকলি নৃত্যের মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান

করা যায় যে কেরল-মালাবার অঞ্চলের লোকনৃত্য হইতেই কথাকলি নৃত্যধারার উদ্ভব। কোন একটি কাহিনীকে সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া কথাকলিতে রূপ দেওয়া হয়।

কথাকলি নৃত্য বীর বা রৌদ্ররস প্রধান। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইহার শিল্পীরা অধিকাংশই পুরুষ। নারীচরিত্রগুলিতেও প্রায়শঃই পুরুষরা রূপদান করে। এই নৃত্যের রূপসজ্জার মধ্যে মুখোশটিই সর্বাগ্রে লক্ষ্যণীয়। কথাকলি নৃত্যবিদ্‌দের মধ্যে গুরু শঙ্করম্ নাম-বুদ্রীপাদ, কুঞ্জকুরু, কৃষ্ণনায়ার, রাভানি পিল্লাই, গুরু গোপাল পিল্লাই, কেলুনায়ার ও গুরু গোপীনাথ বিখ্যাত।

কথাকলির রূপসজ্জা

কথাকলি নৃত্যের রূপসজ্জা চরিত্র অনুযায়ী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন, (১) পাচ্চা (২) কাত্তি (৩) তাড়ি (৪) কারি (৫) মিনুক্কু এবং চরিত্র অনুসারে মুখচিত্রণ করা এবং ভূষণ ও বেশভূষা ধারণ করা হয়।

পাচ্চা: সত্ত্বিক ভাবাপন্ন ও মহিমান্বিত রাজার চরিত্র, যেমন, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, লক্ষণ, অর্জুন প্রভৃতি। তাঁদের কপাল সাদা, লাল ও কালো রঙে রঞ্জিত করা হয়। মুখের সম্মুখভাগ গাঢ় সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। এবং নীচের চোয়াল বরাবর চুট্টি দেওয়া হয়। লাল অধর, কালো চোখ ও ভ্রূ আঁকা হয়।

কাত্তি: রজঃগুণ সম্পন্ন কুটিল চরিত্র, যেমন দুর্য্যোধন ও কীচক প্রভৃতি। মুখের সবুজ রঙের সঙ্গে লাল দেওয়া হয়, ইহাতে চুট্টি ব্যবহৃত হয়। মুখরঞ্জন সমাপ্তির পর একটি লাল সরু কাপড় মাথার খুলির নীচে বাঁধা হয় এবং তার ওপর সাদা রঙে রঞ্জিত করা হয়। একে চুট্টিনতা বলে। ভ্রূ'র ঠিক ওপরে লাল রেখা টানা হয়। তার ওপর সাদা রেখা দেওয়া হয়। নাকের মধ্যস্থলে সাদা ও লাল রঙের কল্‌কা কাটা হয়। তার ওপর সাদা শোলার ছোট ছোট বল

স্থাপন করা হয়। তাকে টিটুপুড়্য বলে। লাল বিরাট গোঁফ আঁকা হয় এবং পাশে সাদা রঙের রেখা থাকে।

তাড়ি ঃ হনুমান, দুঃশাসন, বালী-সুগ্রীব ও মহাদেবের কিরাত প্রভৃতি চরিত্র। মুখের উপরিভাগ কালো, নাসিকার অগ্রভাগ ও মুখের নিম্নাংশ লাল রঙে রঞ্জিত। চিবুকের দুই পাশে চুট্টি দেওয়া হয়। অধরে সাদা রঙের ওপর কালো ছাপ থাকে। মুখগহ্বরে দাঁত ব্যবহার করে এবং সাদা তুলোর দাড়ি লাগানো হয়। শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে কালো দাড়ির ব্যবহার হয়। দস্যু প্রভৃতি বোঝাতে লাল দাড়ির ব্যবহার করা হয়। মুখের উপরিভাগ কালো এবং লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়।

কারি ঃ রাক্ষসী চরিত্র, যেমন পুতনা, তাড়কা, সুর্পনাখা প্রভৃতি। কালো রং ব্যবহৃত হয়।

মিনুক্কু ঃ মহৎ চরিত্র, সতীনারী, মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। হলুদ ও লাল বর্ণের হয়। ললাটে চন্দন তিলক এবং আঁখি পল্লবে কাজল বা শূর্মার প্রলেপ দেওয়া হয়।

'কিরীটম্'—মুকুট, (মুকুটের পশ্চাতে মণ্ডল বা চাকতি থাকে তাহাকে কেশভরম্ বলে)। "কেশভরম্" মুকুটের দুই পার্শ্বেও দুইটি মণ্ডল থাকে, ইহাকে তোড়া বলে।

উরুতেকেট্টা—ঘাগড়া।

পাড়িএরেজানম্—কটিবন্ধ হিসাবে একটি ঝালর-এর মত ব্যবহার করে।

পাটুওয়াল—লাল কাপড়ের টুকরা ঘাগড়ার ওপর দিয়া ঝুলান থাকে।

কুপ্পায়াম্—পুরাহাতের জামা।

উত্তরীয়ম্—চাদর (প্রান্তদেশে আয়না থাকে)

'মুণ্ডি'—পোষাকের সম্মুখভাগে জরীর কারুকার্য খচিত নীবি-বন্ধকে মুণ্ডি বলে)

কোটালারাম্—বক্ষে কাপড়ের টুকরা বাঁধিতে হয়, ইহাকে কোটালারাম্ বলে।

অলঙ্কার—গোলাকৃতি অবতল 'কুণ্ডলম্' এবং ক্ষুদ্রাকৃতি 'চেভিকুট্টু' উল্লেখ যোগ্য।

মুকুটের নীচে লাল কাপড়ের সরু বন্ধনীকে 'চুট্টিতুনী' বলে, ইহার উপর যে সিঁথি পরা হয়, তাহাকে 'নারা' বলে, কৃত্রিম কেশকে 'চামরম্' বলে।

পুঁতির হারকে "কাজুহারম্" বলে' স্কন্ধে যে গহনা ব্যবহরে করে তাকে "তোল্‌ভালা", বাজুকে "ভালা", এবং মণি বন্ধের গহনাকে "কটকম্" বলে।

কথাকলির তাললিপি

কথাকলিতে ভিন্ন ধরণের তাল ব্যবহৃত হয়। এইগুলি হইতেছে, চেম্বাড়া (আদি), চম্পা (ঝম্পা), আতা (আড়ান্দা), পঞ্চারি (রূপক)। এই তালের চিহ্ন নিম্নরূপ—

হাতের আঘাত = I.
অঙ্গুলির কর গুণা = o
ফাঁক = X.

তাল	মাত্রা	তালের স্বরূপ
চেম্বাড়া	৮	IoooI X X X
চম্পা	১০	IooooooII X
আড়ান্দা	১৪	IooooIooooI X I X
পঞ্চারি	৬	IoooI X

এই নৃত্যের তালে জাতি হিসাবে মাত্রার পরিবর্তন হয় না মাত্রা হিসাবে তাল নির্ণয় হয়।

কথাকলি কলাসম্

১।	তি	তি	তেইয়াম্	ধাতা
	তিতি	তি	তেইয়াম্	ধাতা
	তি	তেই	তিতি	তেই
	ধিতে	ইত্যা	ধিত্তা	ধিগিতা
	থেই			
	|	|	|	|
২।	তৎ তা	তৎ তাকা	তা তাকা	তাকা তা
	তাকা তাকা	তা তাকা	তা তিৎ	তিকি তি
	তিকি তিকি	তি তিকি	তি তৎ	তাকা তা
	তাকা তা	তিৎ তিকি	তি তিকি	তি তাকা
	তা তাকা	তা তাৎ	তা তিকি	তি তিকি
	তি তি	তি তেই	ধিন তাকা	ধি তি
	তেই—	——	ধিত তাকা	ধিগি তা
	থেই			

সারি নৃত্যের বোল

|	|	|	|
তেই	ইত্যাম্	ইত্যা	থেই
|	|	|	|
তেহাই—থাকা থেইয়া	কা	ধিগি তাকা	তাদি ঘেনে

কথক

কথক—কথক নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। কাহারও মতে হরিদাস স্বামীর সময় হইতে কথক নৃত্যের আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ এই নৃত্যের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল। মধ্যযুগে এই নৃত্যের রূপের পরিবর্তন হয়। মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে নৃত্য দেবমন্দির হইতে রাজদরবারে স্থান পাইল। নৃত্যের যে মূলভাব ছিল—ভক্তিরস দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা, তাহা মোগল রাজত্বে নষ্ট হইয়া যায় এবং নৃত্যের উদ্দেশ্য বিপথগামী হয়। ফলে ইহার বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যায়। মোগল রাজত্বকালে হিন্দুকৃষ্টির উপরে আসে নানাপ্রকার আঘাত। বাদশা ঔরঙ্গজেব ছিলেন সঙ্গীত সাধনার বিরোধী। কারণ সঙ্গীত তখন কেবলমাত্র বিলাসের উপকরণ হইয়াছিল। বাদশা বিলাসিতা পছন্দ করিতেন না, কারণ তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি শিল্পীদের দরবার হইতে বহিষ্কৃত করেন। শিল্পীরা জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে পৌরাণিক কাহিনী সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকসমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যও সাধিত হইল এবং সংগীতের বিকাশ ও উন্নতিও হইতে লাগিল। যাহারা এইরূপ কথকতা করিতেন, তাঁহারা কথকি বা কথক ঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহাভারত ও নাট্যশাস্ত্রে 'কথক' শব্দের উল্লেখ আছে। ইঁহারা গ্রন্থিক, পাঠক বা বৈতালিক প্রভৃতি নামেও পরিচিত হইতেন। ইঁহারা ভাব, অভিনয়, গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে দেবদেবীর লীলাকীর্ত্তন করিতেন বা পৌরাণিক গাথা উপাখ্যান ইত্যাদি পাঠ করিতেন—এই সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত নৃত্যাধারাই 'কথক' নৃত্য রূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। আবার কাহারও মতে কথা বা বোল বলিয়া নৃত্য করা হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

কথক নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন এলাহাবাদের অন্তর্গত হণ্ডিয়া তহশীল নিবাসী ঈশ্বর প্রসাদজী। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কথিত

আছে যে নটবর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই নৃত্যের সংস্কার করেন এবং তিনি ইহার নাম 'নটবরী' রাখেন। ইহার নামকরণ লইয়া বহু বিবাদ ও মারা মারি হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'কথক' নামকরনই স্থির হয়। তাঁর তিন পুত্র ছিল অড়গুজী, খড়গুজী ও তুলারামজী। অড়গুজীর তিন পুত্র—প্রকাশজী, দয়ালজী ও হরিলালজী।

লক্ষ্ণৌর নবাব আসাফুল্লা শাহের সময়ে প্রকাশজী এলাহাবাদের হাঁড়িয়া গ্রাম হইতে আসিয়া লক্ষ্ণৌতে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি নবাবের দরবারের নর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কথক-নৃত্যে কিছুটা পরিবর্তন আসে। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ঠাকুর প্রসাদ মিশ্র নবাব ওয়াজেদ আলির নৃত্যগুরু ও সভানর্ত্তক ছিলেন। ঠাকুর প্রসাদজীর ভ্রাতা দুর্গা প্রসাদজীর পুত্র বিন্দাদীন মহারাজ ও কালকা মহারাজ কথক নৃত্যের নানা পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। বিন্দাদীন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি ভগবান কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেক ভজন ও ঠুংরী রচনা করিয়া গিয়াছেন পূর্বে কথক নৃত্যের নর্ত্তক কবিতা বলিয়া নৃত্য করিতেন। ঠাকুর প্রসাদ মিশ্র ইহার পরিবর্তে বোল পরণ বলিয়া কথক নাচের প্রচলন করেন। মহারাজ বিন্দাদীনের ভ্রাতা কাল্‌কা মহারাজের সুযোগ্য তিন পুত্র অচ্ছান মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজ কথক নৃত্যের বিখ্যাত ধারক ও বাহক। জয়পুরী—জয়লালজী, সুন্দর প্রসাদ, রামনারায়ণ মিশ্র, অচ্ছান মহারাজের পুত্র ব্রিজ মোহন প্রমুখও বিশিষ্ট নৃত্যবিদ্‌। সাম্প্রতিক কালে গোপীকিষাণ, সিতারা দেবী, রোশন কুমারীও কথক নৃত্য দ্বারা জনমানস জয় করিয়াছেন।

আনুমানিক এয়োদশ চতুর্দশ শতকে (ইস্লামিক যুগে) পারস্য ও খোরাসান হইতে বিপুল অর্থব্যয়ে বহুসুন্দরী নর্ত্তকী আমদানী করা হয় ভারতে। তাহাদের কথক নৃত্য চর্চ্চার ফলে এবং মুসলিম বাদশার দরবারে এবং ওমরাহদের বিলাসকক্ষে প্রদর্শনের ফলে কথক নৃত্য

বৈদেশিক শৈলীতে (ইস্লামিক) প্রভাব পড়ে। দুইটি সংস্কৃতির মিলনে ফলে কথক নৃত্যশৈলীতে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহারই প্রতিফলন দেখা যায় আজিকার কথক নৃত্যে। পোষাক পরিচ্ছদ ও আঙ্গিকের পরিভাষাগুলি বিদেশী প্রভাবান্বিত। যেমন;—রাধা হইলেন 'সাকী,' আগমন হইল 'আমদ', প্রস্তুত হইল 'অদা' প্রণামী বা নমস্কার হইল 'সেলামী'।

বর্ত্তমানে কথক নৃত্যের প্রধানত দুটি ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি জয়পুর ঘরাণা, অপরটি লক্ষ্ণৌ ঘরাণা। বেনারস ঘরানা বলিয়া আর একটি ঘরানাও প্রচলিত আছে তবে উহার প্রচলন খুব কম এবং উহা জয়পুর ঘরানার উত্তরাধিকারীদের দ্বারাই সৃষ্ট। শাস্ত্রের যাবতীয় নিয়মকানুন পালন করিয়াও নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা কোন শৈলীকে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করাকেই সাঙ্গীতিক ঘরানা বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। যিনি এক্ষেত্রে বিশেষ মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন, তাঁহারই নামে ঐ ঘরানার পরিচয় বহন করেন তাঁহার বংশধর ও শিষ্যরা। এইরূপেই গীত, বাদ্য ও নৃত্যে বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হইয়াছে।

ঘরানা কথার দ্বারা একটি বিশেষ নৃত্যের ধারাকে বুঝায় যাহা বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীগণ স্বীয় শিল্পকে নিজ নিজ প্রতিভা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহা তাহার শিষ্যগণ ব্যতীত অন্যকেহ উহার প্রদর্শন করিতে না পারে। এইভাবে নৃত্যের কয়েকটি ধারার বিশেষ প্রচলন হয় এবং এই বিশেষ ধারাগুলি "ঘরানা" নামে পরিচিত বা আভহিত হয়। নিম্নে কথক নৃত্যের তিনটি ঘরানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :—

বেনারস ঘরানা

এই ঘরানার উদ্ভব রাজস্থানে কিন্তু বেনারসে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। বহুপূর্বে রাজস্থানে "শ্যামল দাস ঘরানা" নামে একটি

বিখ্যাত ঘরানা ছিল। ইহা দুটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—একটি "জয়পুর ঘরানা" নামে পরিচিত এবং অন্যটি "জানকী প্রসাদ ঘরানা" যাহা এখন "বেনারস ঘরাণা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

চুন্নীলাল, দুল্লারাম; গনেশীলাল প্রমুখ, জানকী প্রসাদের শিষ্য ছিলেন ' ইঁহার মধ্যে শেষোক্ত দুইজন সম্পর্কে জানকী প্রসাদের ভাই 'ছিলেন। এই প্রখ্যাত শিল্পীদ্বয় শিক্ষান্তে বেনারসে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং ইঁহাদের দ্বারাই—"জানকীপ্রসাদ ঘরানা" বা "বেনারস ঘরানা" প্রসিদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করে।

বেনারস ঘরানার নৃত্য বোলের মৌলিকতা, হাব-ভাব-তৈয়ারীর স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতি-বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইহাতে তবলা বা পাখোয়াজ-এর বোল অপেক্ষা নৃত্যের বোলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ঘরানার গতি, মুদ্রা ও অঙ্গ প্রভৃতি হইতে বেনারস ঘরানার এই সকল বিভাগের পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। এই ঘরানার শিল্পী খুবই অল্প।

জয়পুর ঘরানা

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ভানুজী মহারাজ দ্বারা জয়পুর ঘরানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাণ্ডব নৃত্য শিক্ষা করেন। তাঁহার পুত্র মালুজীকে নৃত্য শিক্ষা দেন। মালুজীর দুই পুত্র লালুজী ও কানুজী। মালুজীর প্রপৌত্র কানুজী বৃন্দাবনে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং তথায় লাস্য নৃত্য শিক্ষা করেন এবং ঐ নৃত্যের আচার্য্য পদলাভ করেন। কানুজীর প্রপৌত্র হনুমান প্রসাদের তিন পুত্র—মোহনলাল, চিরঞ্জীলাল ও নারায়ণপ্রসাদ। হনুমানপ্রসাদের ভাই হরিপ্রসাদ কথক নৃত্যে নিপুণ ছিলেন। হরিপ্রসাদের খুল্লতাত পুত্র চুনীলালের দুই পুত্র ছিল—পণ্ডিত জয়লাল ও পণ্ডিত সুন্দরপ্রসাদ। ইঁহারা জয়পুর ঘরানার নৃত্যাচার্য্য ছিলেন এবং এই ঘরানার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

এই ঘরানায় তাণ্ডব নৃত্যের প্রভাব খুব বেশী। এই ঘরানার নৃত্যে সঙ্গত করিবার জন্য তবলা ও পাখোয়াজের বোল অত্যাবশ্যকীয়। জয়পুরী ঘরানার তাল ও লয়ের কাজ খুবই কঠিন—কিন্তু ভাব ও লাস্যের একান্ত অভাব। বর্তমানে কিছু কিছু গৎ-ভাও এই নৃত্যে দেখা যায়। বর্তমানে এই ঘরানার প্রতিনিধিদের মধ্যে রাম গোপাল ও রোশন কুমারীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

লক্ষ্ণৌ ঘরানা

আচার্য্য ঈশ্বরী প্রসাদের সময হইতে "লক্ষ্ণৌ ঘরানার" উৎপত্তি বলিয়া মনে করা হয। তিনি এলাহাবাদের হাঁডিযা তালুক নিবাসী ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "নটববী কথক নৃত্য" -কে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আচার্য্য ঈশ্বরী প্রসাদকে আদেশ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদের তিন পুত্র—অডগুজী, খড়গুজী ও তুলগুজী (তুলারাম)—ইঁহাদের তিনি যথারীতি নৃত্য শিক্ষা দিযাছিলেন। অড়গুজীরও তিন পুত্র ছিল—প্রকাশজী, দযালজী ও হরিলালজী; ইঁহারা পিতাব মৃত্যুর পরে লক্ষ্ণৌতে চলিযা যান। অতঃপর প্রকাশজী নবাব আসিফুদ্দৌল্লার বরবারে নর্তকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ইঁহারও তিনটি পুত্র—দুর্গাপ্রসাদ, ঠাকুরপ্রসাদ ও মানজী। মহারাজ ঠাকুর প্রসাদ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নৃত্যগুরু ও সভানর্তক ছিলেন। —তাঁহার "গণেশ পরণ" অত্যন্ত লোকপ্রিয ছিল। ১৮৫৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয। দুর্গাপ্রসাদেরও তিনপুত্র ছিল—মহরাজ বিন্দাদীন কালিকাপ্রসাদ ও ভৈরীপ্রসাদ।

কথক নৃত্য প্রদর্শনের রীতি—সর্বপ্রথম মঞ্চে লহরা বাজিতে শুরু করে, পরে তবলাবাদক এক চক্করদার পরণ বাজায়, তারপর নৃত্যশিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করে। প্রথমে নিকাস ও আমদ দেখায়। শিল্পী ইহার পরে বিভিন্ন ঠাঁট (দাঁড়াইয়া বিভিন্ন ভাব ও মুদ্রা দেখানো) প্রদর্শন করে। এই সময়ে তবলায় সাধারণ ঠেকা বাজে এবং প্রয়োজন বোধে শিল্পীর সহিত অথবা পৃথক ভাবে ছোট ছোট

মোহর অথবা তিহাই দিয়া 'সম'-এ আসে। ইহার পরে শিল্পী সেলামী বা নমস্কার টুক্‌রা প্রদর্শন করে। মোগল আমলে নৃত্যের প্রারম্ভে নবাব বা রাজাকে নৃত্যের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানোর রীতি ছিল—ইহাই সেলামী টুক্‌রা বা নমস্কার। এখন সব শিল্পী সেলামী বা নমস্কার প্রদর্শন করে না, অপ্রয়োজন বোধে। সেলামীর মুসলমান ও হিন্দু শৈলীর মধ্যে লক্ষ্যনীয় পার্থক্য বর্তমান। ইহার পরে কেহ কেহ সাধারণ দর্শকের উপরে প্রভাববিস্তারের জন্য কিছু তৎকার দেখান। কিন্তু তৎকার সাধারণতঃ নৃত্যের একেবারে শেষ ভাগে দেখানো হয়; শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুযায়ী ইহাই সঠিক নিয়ম।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী সেলামীর পরে তোড়া, পরণ ও তিহাই দেখানো হয়। কখনও কখনও তোড়া নাচিয়া দেখাইবার পূর্বে হাতে তাল দিয়া দেখানো হয়। বিভিন্ন লয়ে তিহাই এবং তিহাই ছাড়া, তোড়াতে অঙ্গ সঞ্চালন এবং পায়ে বোল দেখানো হইতে থাকে। অনেক সময় তবলার সহিত পায়ের কাজের প্রতিযোগিতা চলে; ইহা দ্বারা সাধারণ দর্শকের মন সহজে জয় করা যায়। ইহার পরে নৃত্যশিল্পী স্বয়ং অথবা তবলাবাদক হিন্দীভাষায় রচিত ছোট কবিতা তালে তালে আবৃত্তি করে এদং পরে ঐটি হস্তের মুদ্রা, পায়ের কাজ এবং ভাব সহকারে নাচিয়া দেখানো হয়। তখন লয় কিছুটা বাড়িয়া যায়, তবলায় সাধারণ ভাবে ঠেকা বাজিতে থাকে। গৎ ভাঁও-এ অত্যন্ত ছোট ছোট কাহিনী মুদ্রা ও ভাবের দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয়; যথা—মাখন চুরি। কালিয়দমন, রাসলিলা ও হোলী প্রভৃতি।

গৎ-ভাঁও এর পর একটি ছোট টুকরা দেখাইয়া 'সমে' পড়িতে হয়। তাহার পরে লয় দ্রুত করিয়া তৎকার দেখাইতে হয়। তৎকারে বরাবর লয়, দুন, তিন গুণ, চৌগুণ প্রভৃতি এবং আড়, কুঁয়াড়, বিঁয়ার প্রভৃতি সব লয়ে দেখানো হয়। শিল্পী পরে তিহাই দিয়া নৃত্য সমাপ্ত করেন।

কথক নৃত্যের বেশ—এই নৃত্যের বেশ বহুকাল হইতেই মুসলমানী। মোগল আমলে নৃত্যশিল্পীদের রাজাশ্রয় দেওয়া হইত। ইহার ফলে বেশভূষা এবং নৃত্যের ভাবে মুসলমানী প্রভাব দেখা যায় এবং এখনও পর্য্যন্ত ইহা বর্তমান। পুরুষ নৃত্যশিল্পী চুড়িদার পাজামা এবং ঘেরদার বারাবন্দী বা জামা পরেন ; তাহার উপরে শেরওয়ানী পরেন। কেহ কেহ জামার উপরে খোলা গলার ওয়েস্ট-কোট পরেন। একটি দোপাট্টা স্কন্ধ হইতে কটি পর্য্যন্ত তির্য্যক ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় ; মাথায় থাকে সাটিনের টুপী বা জরীর টুপী। মহিলা নৃত্যশিল্পী-রাও অনুরূপ পোষাক পরেন। অবশ্য কখনও কখনও তাঁহারা শাড়ী-ব্লাউজও পরেন। শাড়ীটি উত্তরপ্রদেশ বা বাংলাদেশের নারীদের শাড়ী পরিবার ধরণে পরা হয়।

কখনও কখনও পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা অন্য এক প্রকার পোষাকও ব্যবহার করেন। এখানে পরিধেয় হয় একটি কামদার বা সাদাধুতি। উর্দ্ধাঙ্গ নিরাবরণ থাকে এলং দুই কাঁধের উপর দিয়া একটি দোপাট্টা দেওয়া থাকে। এই পোষাক মুসলমান রাজত্বের পূর্বে প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলার যখন রূপদান করা হয় তখন নর্তক এইরূপে বেশ-ভূষা করিয়া থাকেন। মাথায় একটি মুকুট পরা হয়।

পুরুষ ও নারী উভয় নৃত্যশিল্পীরই কানে কুন্তল, গলায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হার ও হাতে চুড়ি থাকে। ইহা ব্যতীত নারীদের নাকে নাকচাবি ও মাথায় ঝাপটা থাকে।

নৃত্যের সপ্ত পদার্থ বা ক্রম

কথক নৃত্য প্রদর্শনের যে ক্রমিক পদ্ধতি আছে, তাহাকে সপ্ত পদার্থ বলে। সপ্ত পদার্থ নিম্নরূপ।—

(১) ঠাট, (২) সেলামী, (৩) আমদ, (৪) নৃত্য-অঙ্গ, (৫) গৎভাও (৬) তৎকার ও (৭) হেলা।

উপরোক্ত সাতটি ক্রমের সমন্বয়কেই বলা হয় সপ্ত পদার্থ। হেলার পর কথক নৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঘরানা হিসেবে (লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর) প্রদর্শন-পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা তফাৎ পরিলক্ষিত হয়।

কথক নৃত্যে সাত অবয়ব

থাঠ, নৃত্যাঙ্গ, জাতিশূন্য, ভাবরঙ্গ, ইষ্টপদ, গতিভাব ও তারানা প্রভৃতি কথক নৃত্যের সাত অবয়ব।

থাঠ—তালের ঠেকার সঙ্গে সমে দাঁড়ান ভঙ্গীকে থাঠ বলে।

নৃত্যাঙ্গ—বোল পরণ লয়ের কাজ দেখান।

জাতিশূন্য—লয়ের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন।

ভাবরঙ্গ—নায়ক-নায়িকাভেদ, সহিত্যপরণ, ভাব পরণ ইত্যাদি প্রদর্শন।

ইষ্টপদ—কবিতাযুক্ত পদ দ্বারা ইষ্টদেব স্তুতির ভাব প্রদর্শন।

গতিভাব—কোন কথা বা বিষয়বস্তুর ভাব প্রদর্শন।

তারানা—তারানা গানের সঙ্গে দ্রুত লয়ের পরন তোড়া ও ভাব প্রদর্শন।

পরিভাষা (Glossary)

হস্তক—বিভিন্ন প্রকার হস্ত সঞ্চালন ও মুদ্রা প্রদর্শনকে হস্তক বলা হয়।

সেলামী—কথক নৃত্য শিল্পী মঞ্চে বা সভায় প্রবেশ করিয়া যে পদ্ধতিতে অভিবাদন জানায় তাহাকে 'সেলামী' (মুসলিম রীতি) বা 'নমস্কার' (হিন্দু রীতি) বলা হয়।

আন্দাজ—কথক নৃত্যের একপ্রকার দাঁড়াইবার ভঙ্গীকে আন্দাজ বলা হয়।

আমদ—ইহার অর্থ আগমন বা প্রবেশ। শিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রথম যে বোল করে তাহাকে আমদ বলা হয়।

টুক্‌রা—এক সম হইতে আর এক সম পর্য্যন্ত এক আবৃত্তির বোলকে টুক্‌রা বলে।

পরণ—এক অধিক আবৃত্তি বোলসমূহকে 'পরণ' বা পরম্ বলে।

পরনে তবলা বা পাখোয়াজের বাণী যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ পাখো-য়াজের সঙ্গে পরণ নাচার রেওয়াজ আছে।

মাত্রা—একটি অখণ্ড সময়কে সমানভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করাকে 'মাত্রা' বলে। অর্থাৎ সংগীতের গতি ও লয়কে যে Unit দিয়া পরিমাপ করা হয় তাকে মাত্রা বলে।

সম—তালের ঠেকার প্রথম বোলকে 'সম' বলে। অর্থাৎ প্রথম বিভাগের প্রথম মাত্রাটিকে বলে 'সম'।

খালি—তালের যেখানে তালি নেই তাহাকে 'ফাঁক' বা খালি বলা হয়।

তালি—দুই হস্তের তালু, একটি দ্বারা অপরটিকে আঘাত করিলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং যাহার দ্বারা তাল রক্ষা করা হয় তাহাকে তালি বলা হয।

বিভাগ—তালে যখন তালি ও খালি হিসাব করিয়া ভেদ দেখান হয়, তখন প্রত্যেক ভাগকে বিভাগ বলা হয়।

আবৃত্তি—কোন তালের সম হইতে পুনরায় আরেকটি সমের আগের মাত্রা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাগকে 'আবৃত্তি' বা 'আবর্তন' অথবা 'চক্কর' বলা হয়।

তাল—ছন্দোবদ্ধ মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলে। তাল দুই প্রকার —'সম পদী' ও 'বিষম পদী'।

লয়—তালের গতিকে 'লয়' বলা হয়। লয় তিন প্রকার ; যথা :—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।

অতি ধীর গতির লয়কে 'বিলম্বিত' লয় বলা হয়। "মধ্যলয় অতি ধীরেও নয় আবার অতি দ্রুতও নয়। অতিদ্রুত গতিতে যে লয় চলে তাহাকে "দ্রুত লয়" বলা হয়।

ঠাট—বোল পরণ সমাপ্ত করিয়া সমে আসিয়া ভাব ও বিশেষ মুদ্রা সহযোগে সুন্দর অঙ্গভঙ্গী সহকারে দাঁড়ানোকে "ঠাঁট" বা "থাট" বলা হয়।

পড়ন্ত—বোল হাতে তালি দিয়া বলাকে "পড়ন্ত" বলা হয়।

তৎকার—পায়ের আঘাত দ্বারা যে বোল হয় তাহাকে "তৎকার" বলা হয়।

নিকাস—কোন ভাব প্রকাশের জন্য যে মুদ্রা বা অঙ্গভঙ্গী করা হয় তাহাকে নিকাস বলে। কোন গৎ ধরিবার পূর্বের প্রস্তুতিকেও "নিকাস" বলা হয়।

তেহাই—কোন ছোট বোলকে পর পর তিনবার করাকে "তিহা" বা "তিহাই" বলা হয়।

পাণ্টা—কোন বোল বারবার বদল করাকে "পাণ্টা" বলে, কিন্তু কথক নৃত্যে গৎ করিবার সময়ে যে ভাবে দক্ষিণ ও বামে ঘোরা হয় তাহাকে "পাণ্টা" বলা হয়।

ভ্রমরী—ঘোরাকে "ভ্রমরী" বলা হয়।

গৎ—কোন বিষয় বা বস্তুকে ভাবে প্রকাশ করাকে "গৎ" বলা হয়। যথা :—বাঁশী, ঘোম্‌টা, গাগরী ইত্যাদি।

চক্রধর (টুকরা, পরণ, তোড়া)—যে বোল এক সম হইতে আরম্ভ হইয়া, তিনবার আবৃত্তি করিবার পরে আরেক সমে আসিয়া শেষ হয় তাহাকে "চক্রধর" বা "চক্করদার" টুকরা, তোড়া ও পরণ বলা হয়। অর্থাৎ টুকরা ঐভাবে তিনবাব ঘুরিয়া সমে আসিলে তাহাকে "চক্রধর টুকরা", তোড়া ঐ ভাবে আসিলে "চক্রধর তোড়া" এবং পরণ ঐ ভাবে আসিলে "চক্রধর পরণ" বলে।

গৎভাও—কোন সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে গৎ ও ভাবে প্রকাশ করাকে "গৎভাও" বলা হয়। যথা :—গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ, মাখন চুরি, বস্ত্রহরণ, হোলী ইত্যাদী।

অঙ্গহার—করণের বিস্তারে অর্থাৎ কয়েকটি করণের সংযোগে অঙ্গহারের সৃষ্টি হয়।

পিণ্ডিবন্ধন—কোন বিশেষ দেব দেবীর মূর্ত্তি বুঝাইবার জন্ত যে মুদ্রা ও করণ ব্যবহৃত হয় তাহাকে "পিণ্ডি" বলে, যথা :—শিবকে বুঝাইতে দুই হস্তের সাহায্যে শিবলিঙ্গ মুদ্রা তৈরী করিয়া দেখানো হয়।

মুদ্রা—হস্তের সাংকেতিক প্রকরণকে "মুদ্রা" বলা হয়। শাস্ত্রীয় মুদ্রা ও নৃত্য মুদ্রায় যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। নৃত্যাভিনয় করিবার জন্য মুদ্রার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুদ্রা দুই প্রকার। যথা —সংযুক্ত ও অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা। দুই হস্তের সংযোগে যে মুদ্রা সৃষ্টি করা হয় তাহাকে "সংযুক্ত মুদ্রা" এবং এক হস্ত দ্বারা যে মুদ্রা করা হয় তাহাকে "অসংযুক্ত মুদ্রা" বলা হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী সংযুক্ত মুদ্রা ১৩টি এবং অসংযুক্ত মুদ্রা ২৪টি।

কাল—সময়কে "কাল" বলা হয়।

মার্গ—তাল দেবার প্রণালীকে "মার্গ" বলা হয়।

ক্রিয়া—কার্য্য করার বিধিকে "ক্রিয়া" বলা হয়।

তালঙ্গ—তাল-এর বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় রূপকে "তালঙ্গ" বলে।

গ্রহ—তালের প্রথম স্থানকে "গ্রহ" বলা হয়।

জাতি—তালের ভাগ করিবার সময়ে যখন মাত্রা বদলাইয়া যায় তখন তাহাকে "জাতি" বলা হয়।

তাল পাঁচ জাতি—তিস্র-৩, চতুস্র-৪, খণ্ড-৫, মিস্র-৭ এবং সংকীর্ণ-৯ মাত্রা।

বেশ—নৃত্য করিবার সময় যে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয় তাহাকে "বেশ" বলে।

অঞ্চিত—হস্ত ও পদকে দূরে বিক্ষেপ করাকে "অঞ্চিত" বলা হয়।

কুঞ্চিত—এক পদাগ্রতল দ্বারা অন্য পদের নিকটে আঘাত করাকে "কুঞ্চিত" বলা হয়।

রেচিত—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করাকে "রেচিত" বলা হয়।

আক্ষিপ্ত—শরীর ঝুঁকানো অর্থে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

মস্তক—শিরকর্মকে "মস্তক" বলা হয়।

ঘুংঘট—ঘোমটকে হিন্দীতে "ঘুংঘট" বলা হয়।

কলাই—হাতের কব্জিকে "কলাই" বলা হয়।

কথক নৃত্য শিপ্রা গুহ

Bea and Flower (ভ্রমর ব ফুল)

Salutation (নমস্কার)

কথাকলি নৃত্যের
সংযুক্ত মুদ্রা

Pandava Brothers (পঞ্চম পাণ্ডব)

Poison (বিষ)

Sky (আকাশ)

Duryodhan

Brother

Indra (ইন্দ্র)

Beautiful Girl (সুন্দরী মেয়ে)

Sri Rama (রাম)

Tortoise (কচ্ছপ)
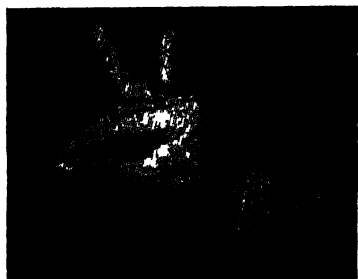
Katakamukha (কটকা মুখ)

Koel Bird (কোয়েল পাখী)
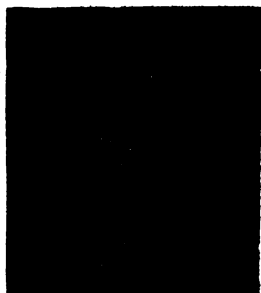
Fish (মৎস্য)

Khatwa (Cot)

Killing

Marriage (বিবাহ পরিণয়)

Wife

Parvati (পার্ব্বতী)

Chariot

Truth
(সত্য অটল আনুগত্য)

Pasha (quarred)
(ঝগড়া, বিবাদ)

Chakra (চক্র)

Seeing (দর্শন)

Soft (নরম)
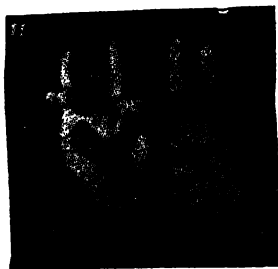
Bee (মউমাছি, মধুকর)

Reason (হেতু, কারণ)

Snake (সর্প)

Lion (সিংহ)

Fight

Husband (স্বামী)

Sin (পাপ)
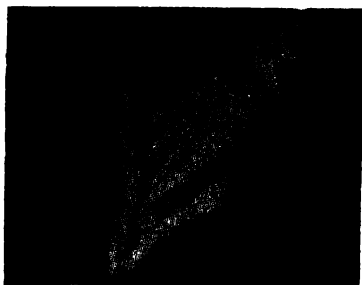
Shankha (শঙ্খ)

Brahman (ব্রহ্মা)

Definile

Boar (বরাহ)

Cock's crest (তাম্রচূড়া)

Ehernuda (পক্ষীযুগল)

৺শম্ভু মহারাজ (লক্ষ্মৌ ঘরাণার কথক নৃত্যের ধারক ও বাহক)

শ্রীমতী বেলা অর্ণব
লক্ষ্মৌ ও জয়পুর ঘরাণার কথক নৃত্যে পারদর্শিনী
(রবীন্দ্রভারতী সংগীত বিভাগের কথক নৃত্যের অধ্যাপিকা)

নেমভ্রূকুটি—ভ্রূর কাজকে "নেমভ্রূকুটি" বলা হয়।

অদা—ভরতনাট্যমের বিভিন্ন হস্ত ও পদচালনার সাহায্যে ও দেহসঞ্চালনের নানাপ্রকার ভঙ্গীমাকে "অদা" বলা হয়। কথক নৃত্যে কোন গীত বা ঠুংরীর ভাবকে বিভিন্ন "হস্তকে"র দ্বারা প্রকাশ করাকেও "অদা" বলা হয়।

ব্যূহক্রিয়া—"ব্যূহক্রিয়া" বলিতে নানা প্রকার গতিতে নৃত্য করা বুঝায় ; যথা :—সর্পগতিতে নৃত্য করাকে "সর্পব্যূহ" বলা হয়, চক্রাকারে নৃত্য করাকে "চক্রব্যূহ" বলা হয়। এইরূপ "বাণ", "সোপান", "কূপ" ইত্যাদি কয়েক প্রকার ব্যূহক্রিয়া আছে।

নৃত্যাঙ্গ—কথক নৃত্যে প্রধান সাতটি অবয়ব আছে ; নৃত্যাঙ্গ উহাদের অন্যতম। ইহাতে বোল, পরণ, লয়ের কাজ দেখানো হয়। সাধারণতঃ তা, থেই, তৎ, তিগধা, দিগ, খিলাঙ্গ, থর্ প্রভৃতি বোল নৃত্যাঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

ভাবরঙ্গ—সাতটি অবয়বের আর একটি হইল "ভাবরঙ্গ"। ইহার দ্বারা নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির ভেদ, ভাব দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ইহার দ্বারা সাহিত্য পরণ (কবিত্ব), ভাব পরণ (ভাবাত্মক গীত) ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নর্ত্তক ইহা ভাবের দ্বারা প্রদর্শন করে। যথা :—

লচকত	কমরম্	দনমদ	ভলকত
×			
লচলনৈ	sননচ	লাsরস	বরসত
২			
মদগম	নীsভোs	হিনীবলি	হাsss
০			
রীsবলি	হাsss	রীsবলি	হাsss
৩			
রী			
×			
৫			

মণ্ডল—পায়ের সঞ্চালনকে "চারী" বলে। যখন বিভিন্ন প্রকার চারী একাদিক্রমে প্রয়োগ করা হয় তখন একটি বিশেষ চাল তৈয়ারী হয়। এই চালকে "মণ্ডল" বলে। অনেক চারীর মিলনে একটি মণ্ডল রচনা করা হয়। মণ্ডল দুই প্রকার—ভূমিমণ্ডল এবং আকাশ-মণ্ডল।

সুলপ্—লাস্য ভাবাপন্ন ভঙ্গী সহযোগে নৃত্য করাকে "সুলপ্" নৃত্য বলে। সাধারণতঃ মণিপুরী ও কথকের গৎভাও এবং ভরত-নাট্যমের লাস্যের অভিনয় অংশেই ইহার অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

উরপ্—অত্যধিক আনন্দের ভাব ব্যক্ত করার ভঙ্গীকে "উরপ্" বলা হয়।

তিরপ্—শিল্পী যখন তির্যক গতিতে নৃত্য করে তখন তাহাকে "তিরপ্" বলা হয়।

শুদ্ধমুদ্রা—হস্তাঙ্গুলির সাংকেতিক প্রকরণকে "মুদ্রা" বলে। "শুদ্ধমুদ্রা" বলিতে শাস্ত্রীয় মুদ্রাকেই বুঝায়। মুদ্রা দুই প্রকার—সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত মুদ্রা।

ধীলাংগ—একই স্থানে লাফাইয়া অঙ্গভঙ্গী করাকে "ধীলাংগ" বলা হয়। সাধারণতঃ পাখোয়াজে ইহার বোল বাজে এবং তাণ্ডব নৃত্যে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

হেলা—হাব ও ভাব দ্বারা যদি শৃঙ্গার রসের সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় তবে তাহাকে "হেলা" বলা হয় অর্থাৎ ভাব যদি অধিকতর পরিস্ফুট ও শৃঙ্গারসূচক হয় তবে তাহাকে "হেলা" বলা হয়।

প্রগল্ভতা—সম্ভোগ বিষয়ে নিঃশঙ্ক ভাবকে "প্রগল্ভতা" বলা হয়।

ঔদার্য—সকল অবস্থাতেই বিনয় প্রদর্শন করাকে "ঔদার্য" বলা হয়।

বাসকসজ্জা—নায়কের আগমন আশায় দেহ ও গেহ সজ্জিত

করিয়া নায়িকা যদি অপেক্ষা করে তবে তাহাকে "বাসকসজ্জা" বলা হয়।

বিপ্রলব্ধা—সংকেত করিয়া, কথা দিয়া, প্রিয়তম না আসিলে ব্যথিত হৃদয় নায়িকাকে "বিপ্রলব্ধা" বলা হয়।

কসক-মসক—এই কথাটি কথক নৃত্যে খুবই ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহার সঠিক ভাব কথা দ্বারা ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নহে। ইহা লাস্য পর্যায়ভুক্ত; ঠাট করিবার সময়ে ইহার প্রয়োগ হয়। লয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে কোনো একটি বিশেষ বোলের বা শব্দের বিস্তৃতি, কম্পন বা রেশটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র দেহের উপরার্ধের গতি ও ভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহাকে "কসক-মসক" বলা হয়। অনেকের মতে, ঠাটের সময়ে লয়ের সহিত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োগ হয় তাহাকে "কসক-মসক" বলা হয়।

ঘুমরিয়া—ইহাকে "ফির্কনী"ও বলা হয়। নৃত্য করিবার সময়ে ঘোরা বা চক্কর দেয়া বুঝাইতে এই শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

ঠেকা—নৃত্যের বা সঙ্গীতের "ছন্দ"কে যখন বোলের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে "ঠেকা" বলা হয়।

শ্লোক—ইহা সংস্কৃতে রচিত বিভিন্ন ছন্দের কবিতা। নৃত্য-গীত করিবার প্রারম্ভে শ্লোক দ্বারা দেবদেবীর প্রশস্তি বা স্তুতি করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

কথানকী—তাল-লয় সহযোগে কোন কথা-কাহিনী বা কবিতার ভাবকে প্রকাশ করাকে "কথানকী" বলা হয়।

তৈয়ারী—তোড়া ও পরণের সহিত অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা দ্রুত লয়ের সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে নৃত্য করাকে "তৈয়ারী" বলা হয়।

ভঙ্গ—কটিদেশের বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে "ভঙ্গ" বলা হয়। যথা:— ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অভঙ্গ, অতিভঙ্গ, ইত্যাদি। কটি দ্বারা বিভিন্ন মুদ্রা প্রদর্শন বা "ভঙ্গ" ভরতনাট্যম্ নৃত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

রেচক—শাস্ত্রে "রেচক" অর্থে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানাবিধ চালনা বুঝায়। সেই অর্থেই ঠাটের সহিত বিভিন্ন অঙ্গের লয়বদ্ধ সঞ্চালনকে "রেচক" বলা হয়; যেমন, ঘাড়, হাত, কটি, পা ও চোখের সঞ্চালনকে যথাক্রমে গ্রীবা রেচক, হস্তরেচক, কটি রেচক, পদরেচক বলা হয়।

পিরমলু—কাহারও মতে "পরিমল" শব্দের অপভ্রংশ "প্রিমলু", কেহ বা বলেন "পিল্লমরু" শব্দের অপভ্রংশ "প্রিমলু"—যাহা হইতে "পিরমলু" কথাটি আসিযাছে। তবলা ও পাখোয়াজের বোলের সহিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করাকে "পিরমলু" বলা হয়।

গতি—পায়ের কাজকে "গতি" বলা হয। গতি দুই প্রকার স্থিরগতি ও চলিত গতি। একই স্থানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করাকে স্থির গতি বলা হয় এবং মঞ্চ বা সভাতে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া নৃত্য করাকে চলিত গতি বলা হয়।

উরমই—তের প্রকার নৃত্যাঙ্গের একটি হইল "উরমই"। লাফাইয়া উঠিয়া একদিক হইতে অপরদিকে গিয়া মাটিতে পা রাখার ভংগীকে "উরমই" বলা হয়। তাণ্ডব নৃত্যে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

লাগ—দুটি ভিন্ন অঙ্গ একত্রে মিলিয়া একটি মুদ্রা গঠিত করিলে তাহাকে "লাগ" বলা হয।

ডাট—আত্মগর্বের প্রকাশকে "ডাট"বলা হয়।

পক্ষীপরণ—নৃত্যে এমন কিছু পরণ আছে যাহা পক্ষীর বোল (শব্দ) দ্বারা সংগঠিত তাহাকেই পক্ষীপরণ বলা হয়। ক, ট, হ, র, ন, প্রভৃতি বর্ণগুলির প্রয়োগ বেশী দেখিতে পাওয়া যায় এই "পরণ" গুলিতে।

ভাব-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বারা অর্থাৎ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করাকেই "ভাব" বলা হয়। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের প্রধান উপাদান এই "ভাব"। ভাবের

অভাবে এই সকলই প্রাণহীন হইয়া পড়ে। ভাব দুই প্রকার— বিভাব ও অনুভাব।

বিভাব—যে কারণে ভাবের প্রকাশ ঘটে সেই কারণকে 'বিভাব' বলে। বিভাবকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে— আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাকে অবলম্বন করিয়া 'ভাব ও 'রস' সৃষ্টি হয় তাহাকে "আলম্বন" বলা হয়। শিল্পী নিজেই আলম্বন।

যাহা ভাবকে উদ্দীপ্ত করে তাহাকে "উদ্দীপণ বলা হয়। স্থান, কাল, বেশ-ভুষা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইত্যাদির দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করাকেই "উদ্দীপণ" বলা হয়।

রস—ভাবের স্থায়ী অবস্থাকেই 'রস' বলা হয়। শিল্পীর আঙ্গিকে ও বাচিক অভিনয়ের ভাবার্থ দ্বারা যদি দর্শকের মনে সাড়া জাগে এবং অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও যদি দর্শক আপনার পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া শিল্পীর ভাবে প্রভাবিত হয় তখনই হয় সার্থক ভাবে প্রভাবিত হয় তখনই হয় সার্থক "রসসৃষ্টি"।

অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী রস নয় প্রকার—(১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) বীর, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক, (৭) অদ্ভুত (৮) বীভৎস ও (৯) শান্ত।

সংস্কৃতির সকল ধারাই এই নয়টি ধারাকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা হইল ভক্তি-প্রীতি-ভালবাসা,—যাহা শৃঙ্গার রসের অন্তর্ভুক্ত তাই ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে-'শৃঙ্গার' রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চমবেদ—আমরা জানি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—বেদের এই চারিটি বিভাগের কথা। ত্রেতাযুগে পৃথিবীর লোকেরা অধর্মে পতিত হওয়ার দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে "পঞ্চম' বেদ সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন: তখন ব্রহ্মা চারি বেদের অর্থাৎ ঋক্ (পাঠ্য ও আঙ্গিক), সাম (গীত) যজুঃ (ক্রিয়াত্মক ও অভিনয়) এবং অথর্ব (রস) এর সারবস্তু লইয়া "নাট্য বেদ" রচনা করিলেন—ইহাই পঞ্চম বেদ।

রাস নৃত্য—ইহা লাস্যপ্রধান নৃত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাই ইহার প্রধান উপজীব্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাসনৃত্য হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লইয়া ইহা মঞ্চস্থ হয়। রাস নৃত্যকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—"তালিরাস" হাতে তালি দিয়া এই নৃত্য করা হয়, "উণ্ডরাস" বর্ত্তমানে ইহাকে "ডাণ্ডিরাস" বলা হয়—ছোট ছোট লাঠি লইয়া এই নৃত্য করা; "মণ্ডল রাস," বহুলোক সম্মিলিত ভাবে মণ্ডলাকারে এই নৃত্য করে।

নৃত্তহস্ত—ধনঞ্জয় বলেছেন: নৃত্তং তাল-লয়াশ্রয়ম"। লয় ও তালের সঙ্গে মনোরঞ্জক পদ-সঞ্চালন হ'ল নৃত্ত। কিন্তু নৃত্তের সময় হাতের যে সব ভঙ্গি দ্বারা লয় ও ছন্দ বোঝানো হয় তাহাকেই বলা হয় "নৃত্তহস্ত"।

গৎ-তোড়া বা গৎ-পরণ—গতের মানে গতি; গতি দু'রকমের—লয়ের গতি ও চলনের গতি। নৃত্যের পরিভাষায় যখন গৎ-তোড়া বা গৎ-পরণ বলা হয়, তখন তা লয়ের গতিকেই বোঝায়, যেমন, একটা গৎ তোড়ার অর্থ একটি নৃত্যের বোল্‌কে বিশেষ কোন ছন্দ এবং লয়ে নিবদ্ধ করে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চৌগুণ প্রভৃতি লয়ে প্রদর্শন করা যা বিভিন্ন ছন্দ ও লয়ে দেখানো হয়ে থাকে, এই অবস্থার গতিকে গৎ-তোড়া বা গৎ-পরণ বলে।

নিকাস-গৎ—গতের মানে সাধারণ অর্থে গতি, গতি দু'রকমের লয়ের গতি ও চলনের গতি। গৎভাও বলা হয় তখন চলনের গতি বোঝায়; আবার যখন গৎ-তোড়া বা গৎ-পরণ বলা হয় তখন তা, লয়ের গতি বোঝায়। আবার ভাবের অভিব্যক্তিকেও গৎ বলা হয়। নৃত্য শিল্পী যখন নৃত্য ছাড়া দেবদেবীদের লীলা মহাত্ম্য বর্ণনা করেন সেই বর্ণনার যে প্রকাশ—অর্থাৎ ভাব অভিব্যক্তি তাকেও বলা হয় গৎ। শিল্পী যখন কোন কাহিনী বা চরিত্র বর্ণনার সময় অংগ ভংগীর দ্বারা ভাব অভিব্যক্তির অর্থ প্রকাশ করেন তাকে বলা হয় নিকাস-গৎ।

পরণ—চক্রদার পরণ—এক অধিক আবৃত্তি বোল সমূহকে পরণ বলে। পরণে তবলা বা পাখোয়াজের বাণী যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ পাখোয়াজের সংগে পরণে নাচার রেওয়াজ আছে। একই পরণের বোল সহ যখন তিনবার তিহায়ের মত বাজাবার বা নৃত্য করার পর সমের মুখে এসে মিলিত হয় তখন তাকে চক্রদার পরণ বলে।

কবিতাঙ্গী—কবিতা বা কোন বর্ণনামূলক কথার সঙ্গে তবলা বা পাখোয়াজের বোল প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে কবিতাঙ্গী বলা হয়।

সৌষ্ঠব—যদি কটিদেশ ও কর্ণ সমরেখায় ও কনুই, স্কন্ধ ও মস্তক সমানভাবে থাকে এবং বক্ষ যদি সমুন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'সৌষ্ঠব' বলে। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমাবেশের নামই 'সৌষ্ঠব'। নৃত্যে ও নাট্যে সৌষ্ঠবহীন অঙ্গ শোভা পায় না। উত্তম ও মধ্যম পাত্রগণের এই সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ, নৃত্য ও নাট্য সম্পূর্ণভাবে এই সৌষ্ঠবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রেখা—অঙ্গসৌষ্ঠব ও অবয়ব সঙ্গতিকে রেখা বলা হয়। রেখা বলিলে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ভঙ্গী বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশকে বুঝায়।

কলাস—নৃত্যকালীন সাময়িক বিরতিকে 'কলাস' বলা হয়। ইহাতে বাদকগণ একই সময় নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিলে পাত্র চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল রহিবেন।

চতুরশ্র—নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে বৈষ্ণবস্থানে যদি হস্তদ্বয় যুগপৎ কটি ও নাভিদেশে সঞ্চালিত হয় এবং বক্ষদেশ সমুন্নত থাকে, তাহা হইলে উহা 'চতুরশ্র' হয়। "কটীনাভিচরৌ হস্তৌ বক্ষশ্চৈব সমুন্নতম্। বৈষ্ণবস্থানমিত্যঙ্গং চতুরশ্রমুদাহৃতম্।" নৃত্তহস্তের ভিতর মুদ্রার উল্লেখ আছে। চতুরশ্রতালেরও উল্লেখ আছে।

মুখচালি—নৃত্যপ্রভৃতির আদিতে যে নৃত্য হয়, তাহাকে "মুখ-চালি" বলা হয়। ইহাতে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ দুই প্রকার গীতের প্রয়োজন হয় এবং মঙ্গলার্থ 'গণেশ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। পর্দার পশ্চাতে নর্তকী পুষ্পথালি লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন পর্দা অপ-সারিত হইলে বাদ্যবৃন্দের সহযোগে দর্শকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নর্তকী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিবেন। কেহ পুষ্পের সংখ্যা একবিংশতি নির্দেশ করিয়াছেন, কাহারও মতে ইহার কোন নির্দেশ নাই। ইহাই নৃত্যের উপক্রমণিকা অথবা মুখচালি।

যতি নৃত্য—বাদ্য জাতীয় শব্দের অক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্গীতের সহিত যে নৃত্য করা হয় তাহাকে 'যতি' নৃত্য বলে। ইহা অত্যন্ত কোমল এবং ইহাতে 'চচ্চতপুট' তাল ব্যবহৃত হয়। যতি-বাদ্যের অক্ষর নিম্নরূপ হয়—তত্তুং তত্তথা দাধি কিট কথো •কিট তকিট ধকিট তাথোংগা থোংগা থৈতাতি থৈতাতি থেই থেই থেই তি থেই থেই থা।

শব্দচালি—বাদ্যযন্ত্রের অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়া ইহা পর্যায়ক্রমে বারবার করা হয় অর্থাৎ বাদ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাদ্যযন্ত্র পুনঃ পুনঃ বিরাম দিয়া বার বার বাজাইতে হইবে। বার্তি-কাদি পাঁচটি মার্গে ইহা করা হয়।

উড়ুপনৃত্য—বিভিন্ন ভঙ্গীসহকারে ভ্রমরী ও চালকের সহিত দ্রুত নৃত্যকে 'উড়ুপ' নৃত্য বলা হয়। উড়ুপ নৃত্যকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

নেড়ি নৃত্য—রেখা, মুদ্রা ও প্রমাণ সহকারে নানাকরবিভূষিত হইয়া দিকচক্রাভিমুখে নৃত্যকে নেড়ি' নৃত্য বলে। ইহা আদি তালে ও বিলম্বিত লয়ে করিতে হয়।

করণ নেড়ি—করণ সংযুক্ত নৃত্যকে 'করণ নেড়ি' বলে

পেরণী—সঙ্গীতরত্নাকরে বলা হইয়াছে—ভস্মপ্রভৃতি শ্বেতচূর্ণ অঙ্গে লেপন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে শিখা ধারণ করিয়া এবং ঘর্ঘরিকা

জাল জঙ্ঘায় বাঁধিয়া পদদ্বয়ের দ্বারা' 'পাট' বাজ্ঞ করিতে করিতে যিনি এই নৃত্য করেন, তাঁহাকে 'পেরণী' বলে।

নৃত্যনাট্য—যে নাটকের আখ্যানভাগ গীত সহ প্রধাণতঃ নৃত্যের মাধ্যমে বিব্রত হয় তাহাকেই বলা যায় নৃত্যনাট্য।

চট্টনৃত্য—ইহা উত্তর প্রদেশের লোক প্রিয় নৃত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই এক সঙ্গে এই নৃত্য করেন। ইহা তাল-লয় প্রধান নৃত্য। এই নৃত্য বিশেষ উৎসবে বা মেলায় হ'য়ে থাকে।

সমবেত নৃত্য (Group dance) (সামুহিক নৃত্য)—দুইয়ের অধিক নর্তক বা নর্তকী একসঙ্গে নৃত্য করিলে তাকে সমবেত বা সামুহিক নৃত্য বলে। যেমন, রাসলীলা ও লোক নৃত্য সামুহিক নৃত্যের পর্য্যায়ে পড়ে।

একক নৃত্য (Solo dance)—একক নৃত্যে কেবল একজন নর্তক বা নর্তকী নৃত্য প্রদর্শন করেন। কথক ও ভরতনাট্যম্ শৈলীতে একজন নৃত্য প্রদর্শন করেন।

চক্রমন—নৃত্যশিল্পী যখন নৃত্য প্রদর্শন করিবার সময় লাগাতার চক্র করেন তখন ঐ চক্রকে 'চক্রমন' বলা হয়।

ন'হক্কা তিহাই—যে তিহাই বা তেহাইতে নয়টি 'ধা' থাকে সে তিহাইকে ন'হক্কা তিহাই বলে। ইহা নয়টি চক্র দিয়া প্রদর্শন করিতে হয়।

যুগল নৃত্য (Duet dance)—যখন দুই নর্তক বা নর্তকী একসঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করেন তখন তা'কে যুগল নৃত্য বলা হয়। রাধাকৃষ্ণ ও শিব-পার্বতী প্রভৃতি 'যুগল' নৃত্য দ্বারা প্রদর্শন করা হয়।

হল্লীসক—মণ্ডলাকারে নৃত্যকে "হল্লীসক" বলে। এটিতে একজন পুরুষনেতা এবং অবশিষ্ট সকলেই স্ত্রীলোক। শ্রীহরি এইরূপ নৃত্য গোপাঙ্গনাদিকে লইয়া করেছিলেন।

রেচক—কোন কিছুর সঞ্চালনকে রেচক বলে। যেমন ঘাড়,

হাত, কটি, পা ও চোখের সঞ্চালনকে যথাক্রমে গ্রীবা-রেচক, হস্ত-রেচক, কটিরেচক, পদরেচক ও নেত্ররেচক বলা হয়।

ভ্রূভংগী—ভ্রূয়ের ক্রিয়াকে ভ্রূভংগী বলা হয়। ভ্রূ'কে উপরে তোলা হলে উৎক্ষিপ্ত বলে। ভ্রূ'কে নীচু করিলে পতন বলা হয়। ভ্রূ কোঁচকানকে ভ্রূকুটি বলা হয়। প্রসারিত করিলে চতুর বলে, নীচু করিলে কুঞ্চিত, এক ভ্রূ তোলা হলে রেচিত এবং স্বাভাবিক থাকিলে সহজ বলা হয়।

তালাঙ্গ—তালের বিভাগকে তালাঙ্গ বলা হয়। এই অঙ্গ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার দ্বারা গঠিত। এই পাঁচটি হল'—'অনুদ্রুত' এক মাত্রায় সীমিত, 'দ্রুত' দুই মাত্রায় সীমিত, 'লঘু' চার মাত্রায় সীমিত, 'গুরু' সাত মাত্রায় সীমিত, 'প্লুত' বার মাত্রা ধরা হয়।

পূর্বরঙ্গ—অভিনব গুপ্তের মতে রঙ্গে যাহা পূর্বে প্রযুক্ত হয় তাহাই পূর্বরঙ্গ। সঙ্গীত দামোদেরে বলা হইয়াছে—নাট্য আরম্ভে শুদ্ধভাবে সভা পূজা হইবার পর কবির গোত্রাদির পরিচয় এবং নাটকের নাম প্রভৃতির সূত্রধার প্রস্তাবণা করিবেন। ইহাকে পূর্বরঙ্গ বলা হয়।

কথক নৃত্যের বোল

সেলামী বা প্রণামী

তাল—ত্রিতাল

(১) তৎ তৎ তাথেই থেইতৎ | আথেই থেইতৎ তৎ তৎ
×   ২

থেই য়াথে ইয়া ত্রাম্ | নমস্ তে,ন মস্তে নমস্

0   ৩

তে
×

(২) তৎ তৎ তাথেই থেইতৎ | আথেই থেইতৎ তৎ তৎ |
×   ২

থেই s তৎ তৎ | থেই s তৎ তৎ | ধা
0   ৩   ×

তাল—ঝাঁপতাল

(সেলামী)

তৎ তৎ | তাথেই থেইতৎ আথেই | থেইতৎ তৎ |
×   ২

তৎ থেই s | s s | তৎ তৎ থেই | s s |
৩   × ২

s তৎ তৎ | ধী
৩

ঝাঁপতালের সেলামী শূল তালে করা যাবে, শুধু শূল তালের মত বিভাগ ও তাল পরিবর্ত্তন করিলেই হইবে।

তাল—ধামার

(সেলামী)

তৎ তৎ তাথেই থেইতৎ আথেই | থেইতৎ তৎ |
× ২

তৎ থেই তৎ | তৎ থেই তৎ তৎ | ধা
0 ৩ ×

ধামার-এর সেলামী আড়া চৌতাল. দীপচন্দী, তেওড়া তালে করা যাবে, শুধু বিভাগ ও তাল পরিবর্তন করিলেই চলিবে।

একতাল

(সেলামী)

তাথেই থেইতৎ। তাথেই থেইতৎ। তৎ তৎ। থেই তৎ।
× • ২ ০

তৎ থেই | তৎ তৎ | তা
৩ ৪ ×

তৎকার

তাল ত্রিতাল

তা থেই থেই তৎ | আ থেই থেই তৎ |
× ২

তা থেই থেই তৎ | আ থেই থেই তৎ |
০ ৩

তাল দাদরা

(তৎকার)

১। তা থেই তৎ | আ থেই তৎ

×

২। তৎ তা থেই | তৎ আ থেই

×

তাল ঝাঁপতাল

(তৎকার)

১। তা থেই ¦ তা থেই তৎ | আ থেই ¦ তা থেই তৎ

× ২ ৩

২। তা থেই | তৎ থেই থেই | আ থেই | তৎ থেই থেই

× ২ ০ ৩

তাল ধামার

(তৎকার)

১। তা থে ই থে ই | তৎ তৎ | আ থে ই | থে ই তৎ তৎ |

× ২ ৩

এক তাল

(তৎকার)

১। তা থেই | — থেই | তৎ — | আ থেই | — থেই | তৎ— |

× ০ ২ ০ ৩ ৪

২। তা থেই | থেই তৎ | থেই s | আ থেই | থেই তৎ | থেই s |

× ০ ২ ০ ৩ ৪

"—" অথবা "s" উভয় চিহ্ন অবগ্রহ বুঝায়।

তিহাই

ত্রিতাল

ধা ধা তে টে | ধা ধা তু না | ধা s s s
× ২ ০

ধা ধা তে টে | ধা ধা তু না | ধা s s s
৩ × ২

ধা ধা তে টে | ধা ধা তু না | ধা
০ ৩ ×

ঝাঁপতাল

(তিহাই)

১। ধি না | ধা গে তির | কিট্ ধা | ধি না ধা |
× ২ ৩

গে তির | কিট ধা ধি | না ধা | গে তির কিট |
× ২ ৩

১ ২ ৩ ৪
২। তিগধাতিগদিগ তিগধাতিগদিগ | থেই s
× ২

৫ ৬ ৭
তিকধাতিগদিগ | তিগধাতিগদিগ থেই |

৮ ৯ ১০
s তিগধাতিগদিগ তিগধাতিগাদগ | থেই
৩ ×

একতাল

(তিহাই)

ধা কিট্ | তক ধিন্ | ধি না | ধা ঽ | ঽ ধা |
× ০ ২ ০ ৩

কিট্ তক্ | ধিন্ ধি | না ধা | ঽ ঽ | ধা কিট্ |
৪ × ০ ২ ০

তক্ ধিন্ | ধি না | ধা
৩ ৪ ×

আড়াচৌতাল

(তিহাই)

তেটে কত | গদি গন | ধা তেটে | কত গদি |
× ২ ০ ৩

গন ধা | তেটে কত | গদি গন |
০ ৪ ০

আমদ

তাল ত্রিতাল

১। ধা তে কে থুং | গা ঽ ধা গে | ধিং গে তা ঽ |
× ২ ০

ধা দিন তা ঽ | ধিৎ তা ক্রে ধা | তা কা থুং গা ।
৩ × ২

তাকি টি,তা কা ঽ | তিটি কতা গদি ঘেনে | ধা
০ ৩ ×

ঝাঁপ তাল

(পরণ)

ধান ধেতেটে | ধেতেটে কতাগ দিঘেনে | ধাss

× ২

ক্রেধাতেটে | ধান ধান ধান , ধা ক্রেধাতেটে |

৩

ধান ধান ধান | ধা ক্রেধ তেটে | ধান ধান

২ ০ ৩

ধান | ধা

ত্রিতাল

(পরণ)

ধেৎ ধেৎ ত্রাক্ ধেৎ | তাগিন্ না ধেৎ ত্বা |

× ২

তাগিন না ধেৎ ত্বা | ধেৎ ধেৎ ধাs ঘেঘে |

৩

তিটি কতা গদি ঘন , ধাs ঘেঘে তিটি কতা

× ২

গদি ঘন ধাs ঘেঘে। তিটি কতা গদি ঘন । ধা

০ ৩ ×

২। তা থেই তাতা থেই । আ থেই তাতা থেই । থেই তা,থে

× ২

ইতা থেই | থেই থেই তৎ তৎ । ধা

৩ ×

১নং ও ২নং এক সঙ্গে করা যায়। শুধু এক নং করিলেও হয়।

ঝাঁপতাল
(আমদ)

ধা তা | কে থুং গা | ধা গে | ঘিং গে তা |
× ২ ০ ৩

ধা দিন | ধা ধিং তা | ক্রে ধা | তা কা থুং |
× ২ ০ ৩

গা তাকি | টি,তা কা তিটি | কতা গদি | ঘেনে ধা s |
× ২ ০ ৩

তিটি কতা | গদি ঘেনে ধা | s তিটি | কতা গদি ঘেনে | ধা
× ২ ০ ৩ ×

স্থূল ঝাঁক তালে উপরের বোল হবে শুধু বিভাগ, তাল, ও ফাঁক প্রভৃতি চিহ্ন পরিবর্ত্তন হবে।

তাল ধামার
(আমদ)

১। তৎ তৎ থেইতৎ তাথেই থেইতৎ | থেই য়াথে | ইয়া ত্রাম্
× ২ ০

তাথেই | থেইতৎ আথেই থেইতৎ তৎতৎ | ধা
৩ ×

২। তা থেই তাতা থেই আ | থেই তাতা | থেই থেই তাথে
× ২

ইতা থেই থেই থেই | তৎ তৎ থেই s থেই |
৩ ×

থেই তৎ | তৎ থেইs | থেই থেই তৎ তৎ | ক
২ ০ ৩

তোড়া

তেওড়া

তাথেই থেইতৎ আথেই | থেইতৎ তাথেই | থেইতৎ আথেই |
×   ২   ৩

থেইতৎ দিগদিগ থেই। দিগদিগ থেই। তৎ থেই। তৎ থেই তৎ।
×   ২   ৩   ×

থেই তৎ। থেই তৎ। ধা
২   ৩

টুকরা

তাল ত্রিতাল

তৎ তৎ থুন থুন। তিগ্‌দা দিগদিগ থেই ঃ।
×   ২

তিগদা দিগদিগ থেই তিগদা। দিগদিগ থেই তিগদা দিগদিগ
০   ৩

তাল ঝাঁপতাল

তিগধা তিগদিগ। থেই তৎ তিগধা। তিগদিগ থেই।
×   ২   ০

তৎ তিগধা তিগদিগ। থেই
৩   ×

তাল ধামার

তৎ তৎ থেই তৎ তৎ। থেই থেই। তৎ তিগদা দিগদিগ
×   ২   ০

ঝিঝ কত থো তরাং। গ তাকা থুন্ থুন্ তিদা।
৩   ×

দিগদিগ থেই। ঃ তিদা দিগদিগ। থেই ঃ তিদা দিগদিগ
২   ০   ৩

তাল একতাল

১। তৎ তৎ । তা দিগ। থুন্ থুন্ । ঝিঝ কত । থো তরাং
x ০ ২ ০ ৩

গ তাকা । থুন্ থুন্ । তিদা দিগদিগ । থেই s। তিদা দিগদিগ
৪ x ০ ২ ০

থেই s। তিদা দিগদিগ।
৩ ৪

২। তিগধা তিগদিগ। তিগধা তিগদিগ। থেই থেই।
x ০ ২

থেই ত্রাম। থেই ত্রাম। থেই ত্রাম।
০ ৩ ৪

পরণ

তাল ত্রিতাল

থেই থেই তৎ থেই । আ থেই তৎ থেই
x ২

থুন তৎতৎ তিগদা দিগদিগ । তাথে ইতা থেই তিগদা।
০ ৩

তাথেইতৎ তাথেইতৎ তক্রাং তক্রাং । থেই s তাথেইতৎ
x ২

তাথেইতৎ। তক্রাং তক্রাং থেই s। তাথেইতৎ তাথেইতৎ
৩

তক্রাং তক্রাং। ধা
x

তাল ঝাঁপতাল

ধাগে ধেং। তাগে ধেং ধাতি। ধা ধাতেরে। কেটেতাক

× ২ ০ ৩

নাকতিং ক্রান। ধা ধাতেরে। কেটেতাক নাকতিং ক্রান।

× ২

ধা ধাতেরে। কেটেতাক নাকতিং ক্রান। ধা

০ ৩ ×

তাল ধামার

ধাগেতেটে তাগেতেটে ধা ক্রেধাতেটে তাগেতেটে। ধা

× ২

ধাগেতেটে। তাগেতেটে তাগেতেটে ধাগেতেটে। ধাগেদিগে

০ ৩

নাগেতেটে ধানধান ধানধান। ধা

×

তাল একতাল

ক্রা-নক্রা -নধা-। তাকিটা, তা কা s s s। তাথেই তৎথেই

× ০ ২

তিগধা, থেই থেইতৎ। থেই থেই তৎsss। থেইথেই তৎ s s।

০ ৩ ৪

থেইথেই তৎতৎ। তা থেইথেই। তৎ থেইথেই।

× ০ ২

তৎতৎ তা। থেইথেই তৎ। থেইথেই তৎতৎ। তা

০ ৩ ৪

তাল-আড়াচারতাল

টুকুরা

ছুম্‌ছুম্‌ ছননন। ছননন নাচত। গিরীধর গোপী। সংগ লেলে
X ২ ০ ৩

হাথ কনকপি। চকা-রী ভাওগত। ইত উত। রাধা পিয়ারী।
০ ৪ ০ X

ধরনহি পা-বত। কৃষ্ণ মুরা-রী। তক্রাং তক্রাং। থেই তক্রাং।
২ ০ ৩ ০

তক্রাং থেই। তক্রাং তক্রাং। থেই
৪ X

চক্রদার পরণ

তাল ত্রিতাল

(গদিগন নাগেতিট তাগেতির কিট্‌তাক।

ধাকি,টধা -নধা- গদিগন ধা-গদি।
২

গনধা- গদিগন ধা- - -)।

উপরোক্ত পরণটি তিনবার করিলে অর্থাৎ ১১ মাত্রা X ৩ =৩৩ হয়, শেষোক্ত মাত্রাটি "সম"-এ আসিবে।

তাল ঝাঁপতাল

তৎ তৎ। থুন্ থুন্ তিগধা। তিগদিগ থেই।

×　　২

তিগধা তিগদিগ থেই। তিগধা তিগদিগ। থেই

৩　　×　　২

তিগধা তিগদিগ। থেইতা থেই।

উপরোক্ত পরণটি তিনবার করিলে 'সম'-এ আসিবে। ১৭×৩ =৫১ শেষোক্ত মাত্রাটি 'সম'।

তাল ধামার

ধাগেতেটে তাগেতেটে ক্রেধাতেটে ধাগেতেটে ধাঘেনে।

×

ধেৎধেৎ ধাগেনাগে। ত্রেকেধেৎ থুন্থুন্ ধাতেটে।

২

ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে।

৩

ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে ধা।

×

উপরোক্ত বোলটি তিনবার করিলে 'সম'-এ আসিবে। ৩×১৯= ৫৭ মাত্রা, শেষোক্ত মাত্রাটি "সম"।

চক্রধর টুকরা

তাল-তেওড়া (তীব্র।)

তৎতৎ থেই,ত্রাম তৎতৎ। থেইত্রাম তৎতৎ। থেইতৎ তৎতৎ।
× ২ ৩

থেইss তৎতৎ থেইss। তৎতৎ থেইss। তৎতৎ থেইss।
× ২ ৩

তৎতৎ থেইss তৎতৎ। থেইss তৎতৎ। থেইss তৎতৎ। ধা
× ২ ৩ ×

তাল-ত্রিতাল

(তিগধা sতিগ ধাs থেই। তিগধা sতিগ ধাs থেই
× ২

তৎ থেই নাদিগ দিগ। থেই দিগদিগ থেই ত্রাম
০ ৩

তাথে ইতা থেই তৎ। তাs থেই তাৎ তা
× ২

থেই তৎ তা)
০

উপরোক্ত বোল তিনবার করিলে 'সম'-এ আসিবে।

চক্রদার তোড়া

তাল ঝাঁপতাল

(থুন্ থুন্। তৎ তৎ তিগধাs। দিগদিগ থেই।
× ২ ০

ss তিগধাs দিগদিগ। থেই তিগধাs। দিগদিগ থেই
৩ × ২

তিগধাs। দিগদিগ থেই)

উপরোক্ত বোল তিনবার করিলে 'সমে' আসিবে।

মণিপুরী

এই উচ্চাংগ নৃত্যের ধারাটির জন্ম উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুর অঞ্চলে। ইহা স্থানায় জনজীবনের ধর্ম্মচেতনাকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। মণিপুরী নৃত্যের প্রাচীন রূপটি বিস্তার লাভ করিয়াছে শিবপার্বতীর কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া ইহাকে "লাইহারওয়া বা লাইহারোবা" নৃত্য বলে। পরবর্ত্তী কালে ঐ অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিলে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কাহিনীই —মণিপুরী নৃত্যের প্রধান বিষয় বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়। মণিপুরী আঙ্গিকের বিভিন্ন নৃত্যের মধ্যে রাসলীলাই প্রসিদ্ধ। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র (১৭৭৯ খৃঃ অঃ) অগ্রহয়াণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রথম রাসনৃত্য আরম্ভ করেন। এই নৃত্য অত্যন্ত কোমল-মধুর ভক্তি রসাশ্রিত। মণিপুরী ধারায় ভঙ্গী নৃত্যই প্রধান। ভঙ্গীনৃত্য দুই প্রকার- পুরুষের নৃত্য ও নারীদের নৃত্য।

মণিপুরী নৃত্যবিদ্‌গণের মধ্যে গুরু আমূবী সিং, গুরু আতম্বা সিং, গুরু আমবী সিং, গুরু বিপিন সিং ও গুরু নদীয়া সিং এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই নৃত্য খোল, মন্দিরা ও সংগীত সহযোগে মঞ্চস্থ করা হয়।

রাস ও লাইহারোবা

মণিপুরের দুইটি প্রধান নৃত্য—রাস ও লাইহারোবা।

রাস—মণিপুরের 'রাস নৃত্য' ভারতীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব অবদান। ১৭৭৯ খৃঃ মণিপুরী নৃত্যে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহ রাসলীলার সৃষ্টি করেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র 'মহারাস' 'বসন্ত বাস' 'কুঞ্জরাস' প্রবর্ত্তন করেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি 'নর্ত্তন রাস' প্রবর্ত্তন করেন। ইহা ব্যতীত 'গোষ্ঠ রাস', 'হালিসা', সাঙ্গি প্রভৃতি রাসের উল্লেখ আছে।

মহারাস—কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে (শারদোৎসবে) মহারাস হইয়া থাকে। এই রাসে শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, কৃষ্ণের অন্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলী, গৃহে গমন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। অচৌবা ও বৃন্দাবন ভঙ্গী পারেং করণীয়।

বসন্তরাস—চৈত্র পূর্ণিমাতে বসন্ত রাস করা হয়। ইহার বিষয় বস্তু হচ্ছে 'দোল' উৎসব। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসবিলাসে মগ্ন হয়ে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ ও আনন্দদায়ক নৃত্য করতে করতে আবির খেলতে থাকেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার রাধার প্রতি আবির নিক্ষেপ করেন এবং পিচকারী দিয়ে রঙ খেলতে থাকেন। তারপর প্রচণ্ডভাবে নৃত্য চলতে থাকে। অচৌবা ও খুরুম্বা ভঙ্গী পারেং সংযোজিত হয়।

কুঞ্জরাস—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে কুঞ্জরাস করিবার নিয়ম আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই রাস নির্দিষ্ট এক কুঞ্জবনে করে ছিলেন বলে একে কুঞ্জরাস বলে। কুঞ্জরাস বর্ণনাত্মক নৃত্য নাট্য। ইহাতে রাধা-কৃষ্ণের অভিসার রূপায়িত হয়। অচৌবা ভঙ্গী পারেং দ্বারা সম্পন্ন হয়।

নর্তন রাস (নিত্য রাস)—বৎসরের সকল সময়ই করা যায় বলে একে নিত্য রাস বলা হয়। আবার এই রাসে নৃত্য গীতের আধিক্য থাকাতে কেহ কেহ নর্তন রাস বলে উল্লেখ করেন। এই রাস নৃত্য গোবিন্দজীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় না। অচৌবা, বৃন্দাবন ও খুরুম্বা পারে ;-এ করার নির্দেশ আছে।

গোষ্ঠ রাস (গোপ রাস)—এই রাসে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বর্ণিত হয়। কার্ত্তিক মাসের গোষ্ঠ অষ্টমীতে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

গোষ্ঠ ভঙ্গী, বৃন্দাবন ভঙ্গী নাচে ও চালিতে শেষ করতে হয়।

লাই-হারাউবা

"লাই' মানে হচ্ছে দেবতা, 'হারাউবা' মানে হচ্ছে আনন্দ বিধান। এই নৃত্য মণিপুরেব প্রাচীন সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। এই নৃত্য মণিপুরের জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতি অঞ্চলে একজন আঞ্চলিক দেবতা থাকেন, তাঁকে বলা হয় 'উমঙলাই' যেহেতু পৃথিবীতে প্রথম সজীব সৃষ্টি অরণ্য, তাই তাকে ভগবানের সৃষ্টি রহস্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে দেবতার অধিষ্ঠান করা হয়। এই নৃত্যের উদ্দেশ্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করা যাতে প্রাকৃতিক বিঘ্নাদি, রোগশোক প্রভৃতির প্রকোপ দূর হয় এবং সুখ সমৃদ্ধি হয়। তাই দেবতার সম্মুখে তাঁরই সৃষ্টির রহস্য নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। এই উৎসবকে মণিপুরী নর্তনের সূচনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

কথিত আছে যে—সাতজন দেবী ও নয়জন দেবতা পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য্যে রত ছিলেন। দেবীগণ-এর জলের উপর নৃত্যের সময় দেবতাগণ মৃত্তিকা ক্ষেপন করেন। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হয়, তখন হারাবা লৈথীঙ্গায় নামে একজন অপদেবতা তা ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। এই অবস্থা দেখে গুরু শিদবার 'নোংথাঙ লৈমা' নামে একজন সুন্দরীকে আদেশ দেন হারাবাকে বশীভূত করতে, তখন নোংথাঙ লৈমা আদেশ পালন করেন। পণ্ডিতগণ এই নৃত্যকে মণিপুরের আদিনৃত্য বলে অভিহিত করেন।

এই নৃত্যধারার পূর্ণবিকাশ ঘটে নোংপোকৃনিংথৌ এবং পাম্খোইবীর সময়। উপরোক্ত দুইজন হলেন দুই দেবদেবী, মণিপুরের হিন্দুরা তাঁদের শিব ও পার্বতীর অবতার বলে বিশ্বাস করেন। লাই-হারাউবা অনুষ্ঠানে নোংপোকৃনিংথৌ এবং পাম্খোইবীর কাহিনী নৃত্য নাট্যকারে পরিবেশিত হয়।

চালি

চালি নৃত্য মণিপুরী নৃত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন। এটি প্রাথমিক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় রূপে শিক্ষণীয়। সাধারণতঃ চালি বলতে চারটি বোলের নাচকেই বোঝায়। কারও কারও মতে পাঁচটি বোলের নাচ।

ভঙ্গী পারেং

ভঙ্গী মানে হচ্ছে নৃত্যের সময় নানাভাবে ভেঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বিন্যাস করা এবং পারেং-এর অর্থ হচ্ছে সারি (series)। ভঙ্গী-পারেং বলিতে ভঙ্গীর সারি বুঝায়। মণিপুরী নৃত্যে ভঙ্গী পারেং পাঁচটি। যথা—অচৌবা, বৃন্দাবন, খুরুম্বা' গোষ্ঠ ও গোষ্ঠবৃন্দাবন পারেং।

প্রথম তিনটি স্ত্রীলোকের, পরের দুইটি পুরুষের।

অচৌবা—কোন কোন গুরুর মতে এটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন ; এবং কারও কারও মতে সম্ভোগ।

বৃন্দাবন পারেং—ইহাতে আছে বৃন্দাবন বর্ণন।

খুরুম্বা—ইহা হচ্ছে যুগল প্রার্থনা। এইগুলি লাস্যে করা হয়।

গোষ্ঠ পারেং—ইহা হচ্ছে গোষ্ঠলীলার বিভিন্ন ক্রীড়ানুকরণ বা বর্ণন।

গোষ্ঠবৃন্দাবন পারেং—ইহা হচ্ছে বৃন্দাবনের বর্ণন।

মণিপুরী নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

খোল, মন্দিরা, ঢোল, ঢোলক, খঞ্জরী, ড্রাম জাতীয় বাদ্য, পেরে (রণশিঙ্গা), মৈবুঙ্ (শঙ্খ), পাখোয়াজ, বাঁশী, গঙ্, করতাল, খোং, এস্রাজ, পেনা, ময়ুরঙ্ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

মণিপুরী নৃত্যের বেশ

মণিপুরী নৃত্যের রূপসজ্জাও অতি মনোহর নয়ন মুগ্ধকর। বিভিন্ন নৃত্যে বিভিন্ন বেশভূষা ধারণ করিতে হয়। রাস নৃত্যে মস্তকের উপর

কালো রঙের পশম জাতীয় বল লাগানো হয়, এটিকে 'কোক্‌তুম্বী' বলে। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষের মাথায় পাগড়ী ও মুকুট, স্ত্রীগণের মাথায় ওড়না ব্যবহায় দেখা যায়। মুকুটের নীচে একটা ফিতা থাকে সেটিকে গলার নীচে বাঁধিতে হয়। রাস নৃত্যে মুখের উপর ব্যবহৃত সূক্ষ্ম ওড়নাটিকে 'মাইখুম্' বলে। ঘাগড়াকে 'কুমিন' বলে' ইহাতে কাচের আয়না ও নানাপ্রকার জরী লাগান থাকে। এই ঘাগরাটির উপর একটি ছোট ঘাগরা থাকে ইহাকে 'পোশওয়ান' বলে। পুরুষের কোমরবন্ধনী ও স্কন্ধেব উপর লম্বমান কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করেন। সম্মুখ প্রান্তে বাঁধিবার কাপড়ের টুকরাটিকে 'থম্বপ্', পার্শ্বে প্রলম্বিত কাপড়ের টুকরাটিকে 'খাওয়ান' (পৈতার মত ঝুলান থাকে) বলে। নর্তকীগণ 'কোকতুম্বীর' নীচে 'কোক-নাম' অথবা সিঁথি পরেন। কোকতুম্বীর সহিত কতকগুলি জরীর ঝুল্‌মি ঝোলান থাকে, তাহাকে 'চুবারৈ' বলে। বিভিন্ন ধরণের গহনা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—ক্‌গুরনাইন (কুন্তল), মরৈ পারেং (দুই সারি হার) কিশঙ্‌লিক্‌ ফাঙ্‌ (চওড়া হার)।

মণিপুরী তাল

প্রাচীন গুরুদের হস্ত লিখিত পুঁথিতে ৪টি মাত্রা ও ১টি তালি দেখা যায়। যথা—১ ২ ৩ ৪। বর্ত্তমানে তিন তাল মেলের মত আটটি মাত্রা ও তিনটি তালি দেওয়া হয়, যেমন—১ ২ ৩ ৪।৫ ৬।৭ ৮।

'তান্‌চপ্' বা 'একতাল' চার মাত্রার তাল। তিন বা ছয় মাত্রার তাল 'মেনকুপ'।

সাত মাত্রার 'তিনতালমচা' প্রভৃতি। 'রাজমেল' ৭ মাত্রা কারও কারও মতে ১৪ মাত্রা।

'তিন তাল অচৌবা' ৮ মাত্রা।

উপরোক্ত তালগুলির পরিমাপক হিসাবে তালি ও খালির ব্যবহার করা হয়। মণিপুরীতে তালি ও খালির পদ্ধতি স্বীয়

বৈশিষ্ট্যময়। এদের বিভাগসমূহ তালির দ্বারা হয়, কিন্তু খালির দ্বারা বিভাগ হয় না, যথা—

জলধিমান — মাত্রা-১৬, তান্থা—৩।

খুদম্ — | |s

\+ ২
s ধিন ধেই গিণগর । ধিন — তা তেন ধিন ।

৩ ০ ০ ০
s ধিন তেন তা তাঁ -তা তেন ধিন

তালের চিহ্ন	মাত্রা	তালি	খালি
‿	১	×	•
০	২	২	
|	৪	৩	
’০	৩		
’।	৫		
s	৮		

তাল

রাজমেল (ভুষণা)

মাত্রা — ৭, তালাঘাত-২।

\+ ২
ধিন — থেন — | ধিন থেন —
\+ ২
ধিন — থেন — | ধিন ধিন —
\+ ২
তেন — তা — | খিৎ ঘিন্ন গর

তানৃচাপ

মাত্রা — ৪, তানৃথা — ১।

আবর্তন—২

+ +

(১) ধিন — খর খর | তা ঘিন ঘিন তা

+ +

(২) ধিন্ তা ধেত্তা তা | ধিন্ ধিন্ তেন তা

মেনকূপ

+ মাত্রা — ৬, তালাঘাত —১।

+

(১) ধিন — তেন | তা ঘিন থেই

+ +

(২) তা খিতা থেন | তা তা থেন তা

+ +

ধিন ঘিনা ধিন | ধিন তেন তা

রূপক

মাত্রা — ৬, তানৃথা -২, খুদম — •।

+ ২ ০

ধিন গ্রগ্র | ধিন তেনৃতা থেন তাংঘিন |

ত্রিপুট

মাত্রা — ৮, তানৃথা — ৩, খুদম্- | ••

+ ২ ৩

ধিন তেন — তা | ধিং তা | ধেন্ তা —

তিস্রতালমচা

মাত্রা — ৭, তাল — ৩, খুদম্ — •'••

+ ২ ৩

ধিন থেন তেত্তা | তাঁ -ধেন | তাঁধে ধেনগ্রগ্র।

তেওড়া, তাঞ্জাও

মাত্রা — ১২, তাস্তা — ৪

খুদম্—।।০০

\+ ০ ২ ০

ধা ঽ তেন তেন । তাং -তা তেন তাং

৩ ৪

খিত্র গ্রাঘিন । -তা খিতা

পরিভাষা

পুং — মৃদঙ্গ।

ঈশৈ — গান।

তান্‌থা— তালি দেওয়া।

হাইদোক্‌পা—খালি।

তান্‌চং বা লোয়চং — তাল বা লয়েব গতি।

পরিং (মপুং, তান্‌বি, তাম্বুং) — তালের ঠেকা।

তান্‌কোক্ — তালের মুখ।

আখাইবা — এক বোল হ'তে অন্য বোলে উত্তরণের মধ্যবর্তী পৃথক্‌কারী বোল।

মান — তিহাই।

আরাউবা—তালকে ছোট হ'তে বড় করা। যেমন, চার মাত্রার একতালকে আট মাত্রার করে বাড়িয়ে করা হয়।

তান্‌চপ্—ইহা চার বা আট মাত্রার গঠিত একটি তাল। আবার একটি তালের মাঝে অন্য তাল এলে ২য়টিকে তানচপ্ বলা হয়। যথা—'নীর নীরদ' ব্রহ্মতালের শেষে

মেলমাতেক আসে। এই মেলমাতেক্‌কে মেলতান্‌চপ বলে।

খুবাক ঈশে—জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময় দশদিন ধরিয়া এই নৃত্য হয়। জগন্নাথ দেবের রথ যখন টানা হয় তখন হাতে তালি দিয়া এই নৃত্য হয়।

চোলম্—এটির মানে চলন্। করতাল, মন্দিরা অথবা পুঙ্ চোলম্ বলিতে বুঝায়, করতলে বা মন্দিরা হাতে লইয়া বিভিন্ন ভঙ্গিতে বাজাইয়া নৃত্য পরিবেশন করা এবং মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে যে নৃত্য করা হয় তা'কে পুং চোলম্ বলা হয়।

শন্ শেন্‌বা—রাখালরাস বা গোষ্ঠ লীলায় এই নৃত্য তাণ্ডব পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কোইচা — আবর্তন
অতপ্পী — বিলম্বিত লয়
ময়াই — মধ্য লয়
অথুবী — দ্রুত লয়
দুণী — দ্বিগুন
মান — তিহাই

কাটা—যে কোন তালকে একটা তালি থেকে কেটে দেওয়া হ'লে সেটি অন্য তালে পরিণত হয়ে যায়।

খোং—জলতরঙ্গের মত বাজনা, কাষ্ঠ নির্মিত।

মুদ্রা

নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে মুদ্রা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন প্রয়োজন তার বর্ণমালা জ্ঞানের, নৃত্য শিক্ষা করিতে হইলে তেমনি প্রয়োজন মুদ্রা জ্ঞানের। যে ব্যক্তি যত মুদ্রা আয়ত্ত করিতে পেরেছেন,

তিনি নৃত্যে তত বেশী পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পেরেছেন। ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মনিপুরী এই চারিটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ভরতনাট্যম্ ও কথাকলিতেই মুদ্রার ব্যবহার বেশী হয়, কথক ও মনিপুরী নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার কম। নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে মুদ্রা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। মুদ্রা হইতেছে নৃত্যের ভাষা ইহার সাহায্যেই নৃত্যের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়।

নাট্যশাস্ত্রে ২৪ প্রকার হস্তভেদের উল্লেখ আছে—

"পতাকস্ত্রিপতাকাশ্চ তথা বৈ কর্ত্তরীমুখঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রো হ্যরালাশ্চ শুকতুণ্ডস্তথৈব চ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থ; খটকামুখঃ।
সূচ্যাস্যঃ পদ্মকোশঃ সর্পশিরা মৃগশীর্ষকঃ॥
কাঙ্গুলকোহলপদ্মশ্চ চতুরো ভ্রমরস্তথা।
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ সন্দংশো মুকুলস্তথা॥
ঊর্ণাভস্তাম্রচূড়শ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ।
অসংযুতাঃ সংযুতাঃশ্চ গদতো মে নিবোধত॥"

অভিদয় দর্পণে ২৮ প্রকার অসংযুত মুদ্রার উল্লেখ আছে—

"পতাকস্ত্রিপতাকোহর্দ্ধপতাকঃ কর্তরীমুখঃ।
ময়ুরাখ্যোহর্দ্ধচন্দ্রশ্চ অরালঃ শুকতুণ্ডকঃ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ।
সুচী চন্দ্রকলা পদ্মকোশঃ সর্পশিরস্তথা॥
মৃগশীর্ষঃ সিংহমুখঃ কাঙ্গুলাশ্চালপদ্মকঃ।
চতুরো ভ্রমরশ্চৈব হংসাস্যো হংসপক্ষকঃ॥
সন্দংশো মুকুলশ্চৈব তাম্রচূড়স্ত্রিশূলকঃ।
ইত্যসংযুত-হস্তানামষ্টাবিংশতিরীরিতা॥"

হস্তলক্ষণ দীপিকায় ২৪টি মূল হস্তভেদের লক্ষণ-এর উল্লেখ আছে।

যথাঃ—পতাক, ত্রিপতাক, মুদ্রাঙ্ক, কর্ত্তরীমুখ, অর্দ্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ কটকামুখ, সূচী কটক, সর্পশীর্ষ, হংস-পক্ষ, মুকুর, ভ্রমর, হংসাস্ত, অঞ্জিল, মুকুল, উর্ণনাভ, পল্লব, বর্ধমানক।

মিশ্রমুদ্রা—উভয় হস্তে ভিন্ন মুদ্রা (একরকম মুদ্রা নয়) প্রদর্শন করাকে মিশ্র মুদ্রা বলা হয়, যেমন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ষম্মুখ (কার্তিকেয়)। ঈশ্বর, শম্ভু, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, বিনায়ক (গণেশ) প্রভৃতি বুঝাইতে মিশ্র মুদ্রা ব্যবহার করিতে হয়।

হস্তমুদ্রার ব্যবহার বিধি

অসংযুক্ত মুদ্রা

পতাক—সকল অঙ্গুলিগুলি সমানভাবে প্রসারিত করিলে এবং কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠটি কুঞ্চিত রাখিলে "পতাক" হস্ত বলে। প্রহারে প্রতাপে, প্রেরণে, হর্ষে, গর্বে, আমি, আমার প্রভৃতি গর্ব প্রকাশে প্রযোজ্য হয়।

ত্রিপতাক—পতাক হস্তে 'অনামিকা' বক্র হইলে ত্রিপতাক হস্ত হয়। নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী প্রদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়—আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, বারণ, প্রবেশ, চিবুকাদি স্পর্শ (দুই অঙ্গুলির দ্বারা), প্রণাম, মুকুট ধারণ।

কর্ত্তরীমুখ—ত্রিপতাক হস্তে মধ্যমা হইতে তর্জনী বিশ্লিষ্ট অবস্থায় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইলে "কর্ত্তরীমুখ" হয়। পথপ্রদর্শনে চরণ-রচনাতে (উদ্ধিরচনায়), চরণ-রঞ্জনে (অলক্তক-রঞ্জনে), কুম্‌কুমাদি দ্বারা তিলক রচনে দংশনে, কর্ত্তনে, শৃঙ্গে, লেখনে, পতনে, মরণে।

অর্দ্ধচন্দ্র—অঙ্গুষ্ঠসহ অঙ্গুলিগুলি ধনুকের ন্যায় বক্রাবস্থায় নত হইলে "অর্দ্ধচন্দ্র" হয়। 'বালতরু, চন্দ্রকলা, শঙ্খ, কলসী, বলয়, বল প্রয়োগে উন্মোচন, গণ্ড ও ভ্রূবিভ্রমের দ্বারা খেদ, ক্রোধ প্রভৃতির প্রকাশে, কৃশ ও স্থূল বস্তুর নির্দেশে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অরাল—তর্জনী ধনুকের ন্যায় নত, অঙ্গুষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি উন্নত ও পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইলে "অরাল" হস্ত হয়। ইহা দ্বারা স্থৈর্য, গর্ব, উৎসাহ, কান্তি (শোভা), আকাশস্থ বস্তু নির্দেশ, গাম্ভীর্য প্রকাশ, আশীর্বাদ প্রভৃতি অভিনয় করা হয়।

শুকতুণ্ড—অরাল হস্তের অনামিকা বক্র হইলে শুকতুণ্ড হয়। 'আমি নই, তুমি নও, করিও না, ইত্যাদির অভিনয়ে, আবাহনে, বিদায়ে এবং অবজ্ঞার সহিত ধিক্কার প্রদানে ইহা প্রযুক্ত হয়।

মুষ্টি—হস্তের তলমধ্যে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহাদিগকে চাপিয়া ধরিলে "মুষ্টি" হয়। প্রহারে, ব্যায়ামে, যুদ্ধে (প্রতিপক্ষের হস্তধারণে, খণ্ডযুদ্ধে), নির্গমে (আদা প্রভৃতি নিঙড়ানে), অসি, যষ্টিধারণে।

শিখর—"মুষ্টি" হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি যদি উর্দ্ধে উত্থিত থাকে, তাহা হইলে "শিখর" হস্ত হয়। রশ্মি (অশ্বরজ্জু), কুশ, অঙ্কুশ, ধনুক ধারণে, অধর ও ওষ্ঠরঞ্জনে, পদরঞ্জনে প্রযোজ্য হয়।

কপিত্থ—শিখর হস্তে অঙ্গুষ্ঠের উপর তর্জনীটি যদি বক্রভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে "কপিত্থ" হস্ত হয়। অসি, ধনুক, চক্র, তোমর, বর্শা, গদা, শক্তি, বজ্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রয়োগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

খটকামুখ—কপিত্থ হস্তে কনিষ্ঠার সহিত অনামিকা উৎক্ষিপ্ত ও বক্র হইলে "খটকামুখ" হয়।

যজ্ঞে, ঘৃতাহুতিদানে, ছত্র এবং রজ্জুঃ গ্রহনে ও ধারনে, মন্থনে, বানাকর্ষণে পুষ্পমালা ও বস্ত্রাঞ্চল ধারণে, পুষ্পচয়নে, স্ত্রীদর্শনে ব্যবহৃত হয়।

সূচীমুখ—খটকামুখের তর্জনী সম্প্রসারিত হইলে "সূচীমুখ" বলা হয়। তর্জনী অধোমুখ, পার্শ্বান্তর কম্পিত, কুঞ্চিত, প্রসারিতও উর্দ্ধমুখী প্রভৃতি বিভিন্ন গতিতে সঞ্চালিত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। বিদ্যুত, চক্র, লতা, কর্ণফুল প্রভৃতি অভিনয়ে প্রযোজ্য হয়।

পদ্মকোশ—অঙ্গুলিগুলি বিরল সংশ্লিষ্ট নহে অঙ্গুষ্ঠের সহিত কুঞ্চিত ও উর্দ্ধমুখী হইলে "পদ্মকোশ" হয়। বিল্ব, কপিত্থ প্রভৃতি ফল গ্রহণে, কুচ প্রদর্শনে, গ্রহনে নানা ডালিম প্রদর্শনে, শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদানে ইহা প্রদর্শন করা হয়।

সর্পশির—অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি অঙ্গুষ্ঠসহ সংহত হইয়া কুঞ্চিত হইলে এবং করতলাভিমুখী হইলে "সর্পশির" হয়। দেবতাদিগকে জলদানে, সর্পগতিতে, তোয় (কুমকুম, চন্দনাদি) সেচনে, মল্লযুদ্ধের সময় উরুস্ফোটনে ব্যবহৃত হয়।

মৃগশীর্ষ—সর্পশিরে কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠা উত্থিত হইলে "মৃগশীর্ষ" হয়। প্রত্যক্ষ বস্তু নির্দেশে, বর্ত্তমান কাল নির্দেশে, 'আছে'—এই ভাব বুঝাইতে, ভবিষ্যত সম্ভাবনা বুঝাইতে, 'অদ্য' বুঝাইতে মৃগশীর্ষ অধোমুখী ভাবে ব্যবহৃত হয়।

কাঙ্গুল—মধ্যমা, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা ত্রেতাগ্নিবৎ স্থাপিত হইলে এবং অনামিকা বক্র এবং কনিষ্ঠা উর্দ্ধে থাকিলে কাঙ্গুল হস্ত হয়। নানাবিধ কাঁচাফল, মুক্তা, বদর (কুলজাতীয় ফল) মৃৎপিণ্ডগ্রাস প্রভৃতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

অলপল্লব—(অলপদ্ম বলা হয়)—করতলে অঙ্গুলিগুলি আবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিয়া পার্শ্বগত ও বিকীর্ণ হইলে "অলপল্লব" হয়। "তুমি কাহার," নাই, এই ভাবটি প্রকাশ করিতে, মিথ্যা বলিতে "ইহা মুল্যহীন" এইরূপ বচন প্রয়োগে, "পুনরায়" ও আমি বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

তাম্রচূড়—মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে, তর্জনী বক্র হইলে এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ করতলে ন্যস্ত হইলে "তাম্রচূড়" হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সশব্দ অবস্থায় বিচ্যুত করিয়া তুড়ি দিলে নির্ভৎসনে, তালে, বিশ্বাস উৎপাদনে, শীঘ্রতা বুঝাইতে ও সংকেত করণে ব্যবহৃত হয়।

চতুর—কনিষ্ঠ উর্দ্ধ অবশিষ্ট তিনটি প্রসারিত এবং প্রসারিত

তিনটির মধ্যদেশে অর্থাৎ মধ্যম অঙ্গুলীর মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠটি স্পর্শ করিয়া থাকিলে "চতুর" মুদ্রা হয়। গ্রহণ, বিনয়প্রকাশ, নিয়ম, গৃহ, ভার্যা প্রভৃতিতে প্রয়োগ হয়।

সন্দংশ—অরাল হস্তের তর্জনী অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত হলে এবং করতলএর মধ্যভাগ ঈষৎ বক্র হইলে "সন্দংশ" হয়।

তৃণ, পর্ণ ও কেশ গ্রহণে, বৃন্ত হতে পুষ্পচয়নে, শলাকার দ্বারা অঞ্জনলেপন প্রভৃতিতে প্রযোজ্য।

মুকুল—হংসমুখকে উর্ধ্বমুখী করিয়া অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ একত্র করিলে "মকুল" হয়। দেবতার অর্চনায়, নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ-কার্যে, পদ্ম ও মুকুল রূপায়নে ব্যবহৃত হয়।

উর্ণনাভ—পদ্মকোশ হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত করিলেই "উর্ণনাভ" হয়। চৌর্যক্রিয়ায়, ধীর অথবা শঙ্কিত ভাবে কোন বস্তুর গ্রহণে, মস্তক চুলকানি, সিংহ ও ব্যাঘ্রের অভিনয়-এ এবং প্রস্তর-গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

ভ্রমর—মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যদি যুক্ত হয় এবং তর্জনী বক্র হয় এবং অপর অঙ্গুলিগুলি উর্ধ্বে উত্থিত হয় তাহা হলে মুদ্রা হয়।

বিশ্বাস উৎপাদনে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তুড়ি দিতে হবে। ইহার দ্বারা স্থলপদ্ম, জলপদ্ম, কর্ণভূষণ প্রদর্শিত হয়।

হংসমুখ—তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হলে এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত হলে হংসমুখ হয়।

উপদেশ, কোমল, সূত্রবন্ধন লেখন, মৃদুত্বের অভিনয়ে ইহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হবে।

হংসপক্ষ—তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই অঙ্গুলিত্রয় সমান ভাবে প্রসারিত হলে, কনিষ্ঠা উত্থিত হলে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত ও উর্ধ্বে থাকিলে হংসপক্ষ হয়। পিতৃতর্পণে, চিন্তার অভিনয়, ব্রাহ্মণদিগের আচমনে, সেতুবন্ধন, নখদ্বারা রেখা অঙ্কন প্রভৃতিতে প্রযোজ্য।

সংযুক্ত মুদ্রা

অঞ্জলি—পতাক হস্তদ্বয় সংযুক্ত করিলে "অঞ্জলি" হয়। দেবতা, গুরুজন ও বন্ধুজন-এর অভিবাদনে ব্যবহৃত হয়।

কপোত—অঞ্জলি হস্তদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে "কপোত" হস্ত হয়। বিনয় প্রদর্শনে, গুরু প্রণামে গুরু সম্ভাষণে ইহা বক্ষঃ স্থলে রাখিতে হয়।

কর্কট—এক হস্তের অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইলে "কর্কট" হস্ত হয়। অঙ্গমোটনে, জৃম্ভণে (হাই তোলায়), স্থূলদেহ বুঝাইতে (উদরের সম্মুখভাগে হাত রাখিতে হইবে), জন সমূহের আগমন প্রভৃতিতে প্রযোজ্য।

স্বস্তিক—অরাল হস্তদ্বয় যদি বামপার্শ্বে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) মনিবন্ধে বিন্যস্ত হয়, তবে তাকে "স্বস্তিক" বলে।

ইহা স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রয়োজ্য। স্বস্তিক বিচ্যুত করিয়া দিক্‌সমূহ, আকাশ, মেঘ, বন, সমুদ্র প্রভৃতির অভিনয় করিতে হয়।

খটকাবর্ধন—একটি খটকামুখ, যদি অপর একটি খটকামুখের উপর ন্যস্ত হয়, তাহাকে "খটকাবর্ধমানক" বলে। ইহা শৃঙ্গার ভাবপ্রকাশে (তাম্বুলাদির গ্রহণে) এবং প্রণামে, পূজা, পট্টাভিষেক-এ ব্যবহৃত হয়।

উৎসঙ্গ—অরাল হস্তদ্বয় বিপর্যস্তভাবে (স্বস্তিকাকারে) স্বাভিমুখে ও বর্ধমানক অবস্থায় অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তটি বামস্কন্ধে এবং বামহস্তটি দক্ষিণ স্কন্ধে থাকিলে "উৎসঙ্গ" হয়। কাহাকেও উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) ধারণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই ইহার নাম উৎসঙ্গ। পরোক্ষভাবে স্পর্শগ্রহণে, নিষ্পেষনে, রোষ প্রকাশে, এবং আলিঙ্গন, লজ্জা ইত্যাদিতে প্রযোজ্য।

নিষধ—মুকুল হস্ত যদি কপিত্থ হস্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তাহা হইলে নিষধ হস্ত হয়। সংগ্রহে, গ্রহণে, ধারণে, নিয়মে, সত্য-বচনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

দোলহস্ত—স্কন্ধ দুইটি শিথিল করিয়া পতাক হস্তদ্বয় প্রলম্বিত ও মুক্ত অবস্থায় রাখিলে দোলহস্ত হয়। সম্ভ্রমে, বিষাদে, মূর্চ্ছায়, মত্ততায়, আবেগে ও নাট্যারম্ভে প্রযোজ্য।

পুষ্পপুট—দুইটি সর্পশির যদি পার্শ্বসংশ্লিষ্ট হইয়া উত্তানভাবে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণের ভঙ্গীতে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে "পুষ্পপুট" বলে। অর্ঘদানে, মন্ত্র বুঝাইতে এবং ধান্য, ফল, পুষ্প সদৃশ নানাবিধ বস্তু গ্রহণে ও জল আনয়ন ও অপনয়নে ব্যবহৃত হয়।

মকর হস্ত—একটি পতাক হস্তের উপর আর একটি পতাক হস্ত উপর্যুপরি বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্ধ্বমুখী এবং অঙ্গুলিগুলি অধোমুখী করিলে "মকর" হস্ত বলা হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, মৎস প্রভৃতি অর্থে প্রযোজ্য হয়।

গজদন্ত—সর্পশির হস্তদ্বয় একটি অপর একটির বাহুকে কনুয়ের ঠিক উপরিভাগে বেষ্টন করে, তখনই তাকে "গজদন্ত" হস্ত বলে। বধূ ও বরকে বিবাহস্থানে আনিতে, শিলা জাতীয় বস্তু উৎপাটন করিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

অবহিত্থ—"শুকতুণ্ড" হস্তদ্বয় বক্ষাভিমুখী করিয়া আস্তে আস্তে (ধীরে ধীরে) অধোমুখী করিলে "অবহিত্থ" হয়। উৎকণ্ঠা, দৌর্বল্যে, গাত্রদর্শনে ইহার প্রয়োগ হয়।

বর্ধমান—হংসপক্ষকে পরাঙ্মুখ করিলেই বর্ধমান হস্ত হয়। পর্দা, বাতায়ন উন্মোচনে ইহার প্রয়োগ হয়।

নাগবন্ধ—সর্পশির হস্তদ্বয় মণিবন্ধে স্বস্তিকাকারে সংযুক্ত করিলে নাগবন্ধ হয়। নাগপাশে প্রযোজ্য।

চক্র—অর্ধচন্দ্র হস্ত অবস্থায় হস্তদ্বয় যখন টেরচা ভাবে পরস্পরের তলদেশ স্পর্শ করে তখন চক্র হস্ত হয়। চক্র অর্থে প্রযোজ্য।

পাশ—সূচী হস্তদ্বয়ের তর্জনী দুইটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও কুঞ্চিত অবস্থায় থাকিলে পাশ হয়। কলহ, বন্ধনে প্রয়োগ হয়।

ভেরুণ্ড—কপিত্থ হস্তদ্বয় মনি বন্ধে সংযুক্ত হলে ভেরুণ্ড হয়। ভেরুণ্ড ও পক্ষীদম্পতী বুঝাইতে প্রযোজ্য।

শঙ্খ—এক হাতের শিখর হস্ত অবস্থায় অপর হাতের অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করিলে এবং শিখর হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত অপর হস্তের তর্জনী দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিলে শঙ্খ হস্ত হয়। শঙ্খ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গরুড়—অর্ধচন্দ্র হস্ত দ্বয়ের একটি অপরের তলদেশে তির্যকভাবে থাকলে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকলে গরুড় হয়। গরুড় অর্থে প্রযোজ্য।

কূর্ম—চক্র হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয় উত্থিত করে প্রসারিতে করিলে কূর্ম হয়। কূর্ম অর্থে প্রযোজ্য।

শকট—উভয় হস্তের ভ্রমর মুদ্রার মধ্যমিকা ও অঙ্গুষ্ঠ মুক্ত করে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পরের সংযুক্ত হইলে শকট হয়। রাক্ষস অর্থে প্রযোজ্য।

সম্পূট—চক্র হস্তের অঙ্গুলী সমূহ সংকুচিত করিলে সম্পুট হয়। কোটা, বাক্স অর্থে প্রযোজ্য।

কীলক—মৃতাশীর্ষ হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠাদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে পিছনের দিকে পরস্পর সংযুক্ত হইলে কীলক হয়। কৌতুক, ক্রীড়া স্নেহ অর্থে প্রযোজ্য।

লোক নৃত্য

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকদের ভাষা, পোষাক রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন,—প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকদের বিভিন্ন প্রকার লোকনৃত্য আছে, প্রত্যেকটি লোকনৃত্য আপন আপন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। লোকনৃত্যগুলির দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকনৃত্যের সুনির্দিষ্ট জন্মকাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ভারতে প্রাণকেন্দ্র হইতেছে গ্রামগুলি এবং এই লোকনৃত্যগুলি ভারতের গ্রামীণ জীবনেরই অঙ্গ অর্থাৎ ভারতের প্রাণসম্পদ। এই নৃত্যে লয়, তাল ও উপজীব্য নির্ধারণ করিবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। ইহার আবেদন যে কোন রুচির দর্শকের প্রাণের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছায়।

প্রধান প্রধান ভারতীয় লোক নৃত্যগুলি হইতেছে :—

উত্তরপ্রদেশে—রামলীলা, হোলী ও দীপাবলী নৃত্য

মহারাষ্ট্রে—গোপ ও টিপরী নৃত্য

গুজরাটে—গরবা ও গরবী নৃত্য

কুমায়ুনে—ছপেলী নৃত্য

পঞ্জাবে—ভাংড়া নৃত্য

নাগাল্যাণ্ডে—নাগা নৃত্য

বাংলাদেশে—গাজন, গম্ভীরা, বাউল, ছৌ ইত্যাদি নৃত্য।

গরবা ও গরবী নৃত্য

"গরবা"— "গরবা" নৃত্য নবরাত্রির সময় 'অম্বা' মাতার সম্মুখে করা হয়। 'অম্বা' মাতা হলেন শক্তির আধার। রংগভূমির মধ্যস্থলে শক্তির প্রতীক হিসেবে মংগলদীপ রাখা হয় এই মংগ-দীপটিকে ঘিরে নারীরা নৃত্য করেন। অনেক সময় ঘড়ার ভিতর মঙ্গলদীপটিকে স্থাপন করে মাথায় নিয়ে নৃত্য করা হয়। অনেক সময় কলসী অথবা কাঠি না নিয়েও নৃত্য করার প্রথা আছে। একতালি, দু'তালি হিসেবে কালের বিভাগ করে এই নৃত্য করা হয়। এই নৃত্যে সকল বয়স্কা নারীরাই অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

"গরবী"—গরবী নৃত্যে পুরুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। মাতা 'অম্বার' প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই নৃত্য করা হয়। 'অম্বার' প্রতিকৃতির সামনে একটা প্রজ্জলিত প্রদীপ রেখে নৃত্য করা হয়।

গরবী নৃত্যের নিজস্ব গীত থাকলেও গরবা নৃত্যের বহু গীত এই নৃত্যে নৃত্য ব্যবহৃত হয়। পুরুষরা কেবল ধুতি পরে অনেক সময় জামাও পরে এই নৃত্য করেন। উপরোক্ত নৃত্যগুলি গুজরাটের লোক নৃত্য।

ডাপ্পু:—ইহা অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নৃত্য। হরিজনগণ ঢোলকবাদ্যের সহিত এই নৃত্য করেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া ঢোলক ও কাঠি থাকে। নর্তকগণ ঢোলক বাজাইতে বাজাইতে কখনও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কখনও দুলিতে দুলিতে পাশে যাইয়া নৃত্য করেন।

আধুনিক নৃত্য

মার্গ ও দেশী এই দুইটি ধারার নৃত্য ব্যতীত সাম্প্রতিক কালে আরও একটি ধারার নৃত্যের প্রচলন হইয়াছে ইহা উপরোক্ত দুইটি ধারার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকে বলা হয় আধুনিক নৃত্য। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় মানুষ সর্বদাই নব নব আবিষ্কারের চেষ্টায় আপনার সমস্ত ধীশক্তি এবং কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় ফলে মানুষ আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে। শিল্প এবং কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও এই প্রয়াস থামিয়া থাকে নাই। মানুষের কল্পনাশক্তি এবং নিত্য নূতন গবেষণার ফল, আজিকার এই আধুনিক নৃত্য। আধুনিক নৃত্যে বিভিন্ন প্রকার রীতি ও শৈলীর সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলা প্রধানত দুইজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীষীর নিকটে ঋণী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীউদয়শঙ্কর এই দুই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী তাঁহাদের কল্পনা-শক্তির দ্বারা নূতনতর আঙ্গিক ও শৈলী রচনা করিয়া আপন আপন মনীষা দ্বারা আধুনিক ভারতের নৃত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বলিতে গেলে ইহারাই ভারতীয় নৃত্যের আধুনিক ধারার স্রষ্টা বা প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ও জাতকের অনেক কাহিনীর গীতিরূপ রচনা

করিয়াছেন, প্রেম-পূজা-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গান রচনা করিয়াছেন এবং এইসব গানের সহিত ললিতছন্দের সুদৃশ্য, মনোগ্রাহী একপ্রকার ভাবপ্রধান নৃত্যধারার প্রচলন করিয়াছেন, ইহাকে রাবীন্দ্রিক নৃত্যও বলা হয়। শ্রীউদয়শঙ্কর একটি বিশ্ববিখ্যাত অবিস্মরণীয় নৃত্যপ্রতিভা—তিনি ভারতের প্রাচীন মন্দির ও গুহাগাত্রের ভাস্কর্য্যগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন এবং সেই সকল মূর্তির ভাব, ভঙ্গিমা, মুদ্রা ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করেন, পরে মার্গনৃত্য ও লোকনৃত্যের সহিত এইগুলির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন একক নৃত্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেন। এই বিশিষ্ট ধারার নৃত্য "ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' নামে পরিচিত। এই সকল নৃত্য, পরিচালনা ও পরিবেশনার গুণে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে।

আধুনিক নৃত্যনাট্যের মধ্যে শাপমোচন, শ্যামা, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ, শকুন্তলা, মদনভস্ম ইত্যাদি অত্যন্ত প্রচলিত ও সর্বজনপ্রিয়। ইদানীংকালে আধুনিক নৃত্যের বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে; অনেক নূতন নূতন নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হইতেছে, যাহার রচনা-শৈলী, আঙ্গিক এবং পরিকল্পনা-পরিচালনার দিক হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের।

তাল

সঙ্গীতাচার্য কোহল বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ-এর মিলনে তালের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'তাণ্ডব' ও 'লাস্যে'র আদ্য অক্ষর দুইটি লইয়া 'তাল' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। তাণ্ডবের সৃষ্টি কর্তা শিব ও লাস্যের সৃষ্টি কর্ত্তা পার্বতী। যাহা হউক, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শিব ও শক্তিকেই তালের সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণও বলেছেন—

"শম্ভোঃ সংপদ্যতে নাদো নাদাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসো জায়তে কালঃ স কালস্তালসংজ্ঞিতঃ॥

শম্ভু হ'তে নাদের জন্ম, নাদ হ'তে মনের এবং মন হ'তে কালের জন্ম হয়েছে। সেই কালই 'তাল' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আদি তাল

সংগীত জগতে তালের উদ্ভবকালে আদি তালের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই জন্যেই এই তালের নাম হয়েছিল আদিতাল। এই তাল চার মাত্রার মধ্যে সীমিত। এর মধ্যে সম, ফাঁক ও তালি কোনটাই দেখা যায় না। এই তাল সর্ব প্রথম এবং সুপ্রাচীন কিনা এই নিয়ে সংগীতবিদ্দের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে ১০৮টি দেশী তালের উল্লেখ আছে তার মধ্যে আদি তালের নাম উল্লেখ নেই। পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ আরও কতগুলি প্রাচীন তালের নাম উল্লেখ করছেন তাদের মধ্যে আদি তালের নাম পাওয়া যায়।

এই তালের ঠেকা নিম্নরূপ—

তাল লিপি

ভাতখণ্ড ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতির তাললিপি

মাত্রা	চিহ্ন (ভাতখণ্ড)	চিহ্ন বিষ্ণুদিগম্বর	উদাহরণ ভাতখণ্ড	উদাহরণ বিষ্ণুদিগম্বর
১	চিহ্ন নাই	—	ধা	ধা —
২	S বা—	ঽ	ধা s বা ধা-	তা ঽ অর্থাৎ তাS
অর্দ্ধমাত্রা	-	০	-গে	ধাতি ০ ০
১/৪	‿ বা ⌴	‿	তেরেকেটে	তেরেকেটে ‿‿‿‿
১/৮	ঐ	‿‿	তকতেরেকেটেতক	ত ক তে রে কে টে ত ক
১/৩	ঐ	১/৩	ধাকিট	ধা কি ট ১/৩ ১/৩ ১/৩
বিভাগ	|	নাই কিন্তু বর্ত্তমানে প্রয়োগ হয়, |		
সম	X	১		
ফাঁক	০	+		
তাল	তালে ক্রম সংখ্যা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। যথা :— X, ২, ০, ৩,	মাত্রা সংখ্যানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় যথা, ত্রিতাল— ১, ৫, + ১৩		

এই গ্রন্থে তাললিপি ভাতখণ্ড পদ্ধতি অনুসারে লেখা হইয়াছে।

ত্রিতালের ঠেকা

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	
ঠায়—	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	|	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	|
	×					২				
	৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬	
	না	তিন	তিন	তা	|	তা	ধিন্	ধিন্	ধা	|
	০					৩				

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	
দ্বিগুন—	ধাধিন	ধিনধা	ধাধিন	ধিনধা	|	নাতিন	তিনতা	তাধিন	ধিনধা	|
	×					২				
	৯	১০	১১	১২	|	১৩	১৪	১৫	১৬	
	ধাধিন	ধিনধা	ধাধিন	ধিনধা	|	নাতিন	তিনতা	তাধিন	ধিনধা	|
	০					৩				

তিনগুণ—

১	২	৩	৪		৫	৬
ধাধিনধিন	ধাধাধিন	ধিনধানা	তিনতিনতা	|	তাধিনধিন	ধাধাধিন
×					২	

৭	৮		৯	১০	১১	১২	
ধিনধাধা	ধিনধিনধা	|	নাতিনতিন	তাতাধিন	ধিনধাধা	ধিনধিনধা	|

১৩	১৪	১৫	১৬		
ধাধিনধিন	ধানাতিন	তিনতাতা	ধিনধিনধা	|	ধা
৩					×

১ ২ ৩ ৪

চারগুণ—

ধাধিনধিনধা ধাধিনধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা।

——— ——— ——— ———

×

৫ ৬ ৭ ৮

ধাধিনধিনধা ধাধিনধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা |

২

৯ ১০ ১১ ১২

ধাধিনধিনধা ধাধিনধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা |

১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ধাধিনধিনধা ধাধিনধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা | ধা

——— ——— ——— ——— ×

৩

ঠায় বা বরাবর লয় :—তালের কোন বোলকে মাত্রা অনুযায়ী এক এক মাত্রায় বলা হয় তাহাকে ঠায় বা বরাবর লয় বলে। (উপরোক্ত ত্রিতালের ঠায়ে যে লয় দেখানো হয়েছে)

দ্বিগুণ :—দুইমাত্রার বোলকে যখন এক মাত্রার বলা হয় তখন তাহাকে দ্বিগুণ লয় বলে। কেহ কেহ দুন্ লয় বলে।

তিনগুণ :—তিনমাত্রার বোলকে এক মাত্রায় মধ্যে বললে তিনগুন লয় বলে।

চারগুণ :—চারমাত্রার বোলকে এক মাত্রার মধ্যে বললে চৌগুণ লয় বা চারগুণ লয় বলে।

এইভাবে অন্য বোলকেও ঠায়, দ্বিগুণ ও চারগুণ করা হয়।

আড় বা দেড়গুণ :—আড় ও দেড়গুণ লয় একই লয়। অর্থাৎ তিন মাত্রার বোলকে দুই মাত্রায় বলা। তিন মাত্রাকে দুইমাত্রায় এক এক মাত্রার মধ্যে দেড় মাত্রার বোল বা বাণী বলতে হয়। ইহাকেই আড় বা দেড়গুণ লয় বলে।

যেমন :—কার্ফা বা কাহারবায় আড়লয়।

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
বরাবরলয় :—	ধা	গে	না	তি	|	ন	ক	ধি	না
	×								
আড়লয় :—	ধা-গে	-না-	তি-ন	-ক-	|	ধি-না	-ধা-	গে-না	-তি-
(১ মাত্রা থেকে)	×					০			
	ন-ক	-ধি-	না-ধা	-গে-	|	না-তি	-ন-	ক-ধি	-না-

দাদ্‌রা-র মধ্যে একটি আড় লয়ের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল।

বরাবরলয় :—	ধা	ধি	না	|	ধা	তু	না
	×				০		
আড়লয় :—	১	২	৩		৪	৫	৬
(তিন মাত্রা থেকে)	ধা	ধি	ধা-ধি	|	-না-	ধা-তু	-না-
	×				০		

(অর্থাৎ ছয় মাত্রাকে চার মাত্রার মধ্যে বলা; আর তিন মাত্রাকে দুই মাত্রার মধ্যে বলার নামই 'আড়লয়')

ঝাঁপতাল (মূল ঠেকা)

মাত্রা—	১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০
বোল—	ধি	না	|	ধি	ধি	না	|	তি	না	|	ধি	ধি	না
তাল—	×			২				০			৩		

তালি ৩, (১, ৩, ৮ মাত্রায়), ফাঁক ১, (৬ মাত্রায়) বিভাগ ৩। মাত্রা ১০।

তেওড়া (মূল ঠেকা)

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫		৬	৭
বোল	ধা	দেন্	তা	|	তিট	কত	|	গদি	গন
তাল	×				২			৩	

তালি ৩, (১, ৪, ৬ মাত্রায়)। বিভাগ ৩। মাত্রা ৭। ফাঁক নেই।

দীপচন্দী

মাত্রা ১৪। ৪ বিভাগ। ১, ৪, ১১, তালি, ৮ খালি।

ধা	ধিন	s	|	ধা	ধা	তিন	s	|
×				২				
তা	তিম	s	|	ধা	ধা	ধিন	s	|
০				৩				

—ঠায়—

ধা	গে	না	|	ধা	গে	ধী	না	|
×				২				
তা	গে	না	|	ধা	গে	ধী	না	|
০				৩				

রূপক

রূপক ইহাও তেওড়ার মত, তবে ইহার প্রথম মাত্রাতেই ফাঁক এবং পরের বিভাগ দুইটিতে তালি পড়ে, যেমন ঃ—

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫		৬	৭
বোল	তি	তি	না	|	ধি	না	|	ধি	না
তাল	০				×			২	

তালি ২, (৪, ৬ মাত্রায়)। মাত্রা ৬। প্রথম মাত্রায় ফাঁক। বিভাগ ৩। (কেহ কেহ বলেন ফাঁক নেই)।

ধুমালী (মূল ঠেকা)

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোল	ধা	ধিন্ |	ধা	তিন |	ত্রিক	ধিন |	ধাগে	ত্রিক
তাল	X		২		০		৩	

বিভাগ ৪ । তালি ৩ (১, ৩, ৭, মাত্রায়)। ফাঁক ১ (৫ মাত্রায়)। মাত্রা ৮। (কেহ কেহ বলেন বিভাগ দুইটি)।

সরস্বতী তাল

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বোল	ধা	s	ধিন্	না |	ঘে	ন |	কি	ট	ঘে	ন
তাল	X				২		৩			

১১	১২	১৩	১৪ |	১৫	১৬	১৭	১৮ |
ধা	গে	তি	ট	ধা	গে	তুন	না |
৪				৫			

বিভাগ ৫ । তালি ৫ (১, ৫, ৭, ১১, ১৫ মাত্রায)। মাত্রা ১৮ খালি নেই।

অর্জ্জুন তাল

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বোল	ধা	s	ধি	ন |	ন	ক |	ধে	s	ধি	ন্।
তাল	X				২		৩			

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ন	ক |	ধে	s |	ধা	s	ধি	ন্ |	ন	ক
৪		৫		৬				৭	

বিভাগ ৭। তালি (১, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৯ মাত্রায়)। মাত্রা ২০, খালি নেই।

এই মাত্রা সংখ্যায়ও দ্বিমত আছে। আর এক প্রকার আছে ২৪ মাত্রার।

গণেশ তাল

মাত্রা	১	২	৩	৪		৫		৬	৭	৮	৯		১০
বোল	ধা	ধা	দেন্	তা	|	ত্রিক	|	তিট	ধা	দেন্	তা	|	ত্রিক।
তাল	×					২		৩					৪

১১		১২	১৩	১৪	১৫		১৬		১৭		১৮		১৯	২০	২১
তিট	।	তাগে	ধাগে	দেন্	তা	।	ধাগে	।	তা	।	তিট	।	কত	গদি	গন
৫		৬					১		৮		৯		১০		

বিভাগ ১০ | তালি ১০ (১, ৫ ৬, ১০. ১১ ১২, ১৬, ১৭ ১৮, ১৯ মাত্রা)। মাত্রা ২১ | খালি নাই।

মন্তব্য : উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারে তালগুলির দ্বিগুণ, তিনগুণ ও চৌগুণ লয় ত্রিতালের নিয়মে হইবে।

সুর ফাঁক (সুলতাল)

মাত্রা	১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮		৯	১০
বোল	ধা	ধা	।	দেন্	তা	।	কিট	ধা	।	তিট	কত	।	গদি	গন
তাল	×			০			২			৩			০	

বিভাগ পাঁচ। তালি ৩ (১, ৫, ৭ মাত্রায়)। খালি ২ (৩, ৯ মাত্রায়)। মাত্রা ১০।

রুদ্রতাল

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বোল	ধা	তৎ ।	ধা ।	তিরকিট ।	ধী	না ।	তিরকিট ।	তু ।	না ।	তৎ	তা
তাল	X		২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	

বিভাগ ৮। তালি ৮ (১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, মাত্রায়) খালি নেই। মাত্রা ১১। (এই তালটি বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়, যেমন : ১১, ১৫, ১৬ ও ১৭ প্রভৃতি মাত্রা।

একতাল

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বোল	ধিন	ধিন ।	ধা	ধা ।	তু	না ।	ক	ত্তা ।	ধাগি	তেটে ।	ধিন ।	তেটে
তাল	X		০		২		০		৩		৪	

বিভাগ ৬ | তালি ৪ (১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রা) | মাত্রা ১২। ফাঁক ২। একতালে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দ্বিমাত্রিক ছন্দ দেওয়া হয়েছে। সবই চৌতাল এর মত শুধু বোলের তফাৎ।

চৌতাল

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বোল	ধা	ধা ।	দেন্	তা ।	কিট	ধা ।	দেন্	তা ।	তিট	কত ।	গদি	গন
	X		০		২		০		৩		৪	

বিভাগ ৬। মাত্রা ১২। তালি ৪ (১, ৫, ৯ ১১ মাত্রায়। ফাঁক ২।

আড়া চৌতাল

মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
বোল ধিন্ তেরেকেটে । ধী না । তু না । কৎ তা ।
তাল × ২ ০ ৩

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
তেরেকেটে ধিন । না ধী । ধী না ।
০ ৪ ০

বিভাগ ৭ । তালি ৪ (১, ৩, ৭, ১১ মাত্রায়)
ফাঁক ৩ (৫, ৯ ও ১৩ মাত্রায়) । মাত্রা ১৪ ।

ধামার

মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ৩২ ২৩ ১৪
বোল ক ধি ট ধি ট । ধা s । গ দি ন । দি ন তা s
তাল্ × ২ ০ ৩

বিভাগ ৪ । তালি ৩ (১, ৬, ১১ মাত্রায়)। খালি ১ (৮ মাত্রায়) । মাত্রা ১৪ ।

ব্রহ্ম তাল

মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
বোল ধা । তৎ । ধেৎ । ধিন । নক । ধেৎ । ধেৎ । ধিন্
তাল × ০ ০

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
নক্ । ধাগে । তিট । কত । গদি । গন

বিভাগ ১৪ । তাল ১০ (১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩ মাত্রায়) । ফাঁক ৪ (২, ৫, ৯, ১৪ মাত্রায়) । মাত্রা ১৪, আর এক প্রকার ব্রহ্মতাল আছে যাহার ২৮ মাত্রা মানা হয় ।

পঞ্চম সবারী বা ছোট সবারী (সওয়ারী)

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫	৬	৭	
বোল	ধী	না	ধীধী	।	কৎ	ধীধী	নাধী	ধীনা	।
তাল	×				২				

৮	৯	১০	১১		১২	১৩	১৪	১৫	
তীক্র	তীনা	তেরকেটে	তুনা	।	কত্তা	ধীধী	নাধী	ধীনা	।
০					৩				

বড় সবারী (সওয়ারী)

মাত্রা	১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮	
বোল	ধী	না	।	ধী	না	।	ধীধী	ধীনা	।	ধীধী	ধীনা	।
তাল	×			০			২			০		

৯	১০		১১	১২		১৩	১৪	
তিsতিরকিট	তুনা	।	তাsতিরকিট	তুনা	।	কত্তা	তিরকিটধিন	।
৩			৪			৫		

১৫	১৬	
গিনধাগে	নধাতিরকিট	।
০		

বিভাগ ৮। তালি ৫ (১, ৫, ৯, ১১, ১৩ মাত্রায়)। ফাঁক ৩ (৩, ৭. ১৫ মাত্রায় খালি)।

লক্ষ্মী তাল

মাত্রা	১		২		৩	৪		৫		৬	
বোল	ধিন্ধা	।	ধিন্ধা	।	তিরকিট	ধিননা	।	ধিন্ধা	।	তিরকিট	।
তাল	×		২		৩			৪		৫	

৭	৮		৯		১০		১১		১২	
ধাধা	তিরকিট	।	ধাধা	।	তিরকিট	।	ধিন্না	।	ধিন্ধা	।
৬			৭		৮		৯		১০	

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তিরকিট	তুনা	কিড়নগ	তাগে	তা	তিরকিট
১১	১২	১৩	১৪	১৫	

এই তালের মাত্রা সংখ্যা নিয়েও মতানৈক্য আছে। কেহ বলেন ১৮ মাত্রা কেহ বলেন ৩৬ মাত্রা, বিভাগ ১৫, তালি ১৫ (১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ মাত্রায়)। মাত্রা ১৮, খালি নাই।

তালের দশটি প্রাণ

সঙ্গীত মকরন্দ-এ উল্লেখ আছে—

কালো মার্গক্রিয়াঙ্গানি গ্রহো জাতিঃ কলালয়ঃ।

যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশস্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ জাতি, কলা লয়, যতি ও প্রস্তার—ইহাদিগকে তালের দশ প্রাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করে গেছেন।

"কাল" অর্থে সময়, এই সময়ই হইল তাল গঠনের প্রধান বস্তু।

মার্গ—ইহার অর্থ পথ। যে রীতি বা চংএ তালকে প্রদর্শন করা হয় তা'কে মার্গ বলে।

শাস্ত্রে চারটি মার্গের কথা উল্লেখ আছে। যথা—ধ্রুব, চিত্রা, বার্ত্তিক ও দক্ষিণ।

ক্রিয়া—হাতের দ্বারা তাল ও ফাঁক প্রদর্শনকে প্রাচীন কালে ক্রিয়া বলা হইত। তাল দেওয়াকে সশব্দ ক্রিয়া, ফাঁক দেওয়াকে 'নিঃশব্দ ক্রিয়া' এই তাল ও ফাঁক প্রদর্শনের একটি বিশেষ রীতি ছিল।

অঙ্গ—তালের পদ বা বিভাগকে অঙ্গ বলে। এই অঙ্গ বিভিন্ন মাত্রার দ্বারা গঠিত হয়।

গ্রহ—গ্রহ অর্থে গ্রহণ করিবার স্থানকে বুঝায়। তালের মধ্যে যে স্থান হইতে সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাকে গ্রহ বলে। গ্রহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—

সম, অতীত ও অনাগত।

'সম' বলিতে সমকাল, অর্থাৎ তালাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই যদি সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয়; তা'কে সমগ্রহ বলে। 'অতীত' সমকালের পরবর্ত্তী অর্থাৎ তালাঘাতের পরে যদি সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তা'কে অতীতগ্রহ বলে, "অনাগত" বলিতে সমকালের পরবর্ত্তী অর্থাৎ তালঘাতের পূর্বে যদি সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাকে অনাগত গ্রহ বলে।

যেমন :—

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২
×	০	২	০	৩	৪

সমগ্রহ অতীত গ্রহ — অনাগত গ্রহ।

কাহারও কাহারও মতে তালের গ্রহ দুই প্রকার যথা—সম ও বিষম। বিষম-এর অন্তর্গত অতীত ও অনাগত। কারণ, বিষম অর্থে যাহা সম নহে সুতরাং অতীত ও অনাগত সমকাল নয় বলিয়া ইহারা "বিষমেরই" অন্তর্গত। ইহা প্রকারান্তে তিনটি 'গ্রহ'কেই বুঝায়।

জাতি—মার্গ তালের জাতি তিস্র ও চতস্রভেদে দুই প্রকার। যে তালের মাত্রা সংখ্যা ৬, ১২. ২৪, ইত্যাদি তাহারা তিস্র জাতি এবং যে তালের মাত্রা সংখ্যা ৮, ১৬, ৩২ দ্বারা গঠিত তাহারা চতস্র জাতি।

কলা—তাল আবর্ত্তনের মধ্যে যে সকল মাত্রায় নিঃশব্দ ক্রিয়া অর্থাৎ ফাঁক প্রদর্শিত হয়, প্রাচীন কালে তা'কে 'কলা' বলা হইত। প্রকৃত পক্ষে তাল কলা বলিতে মাত্রাকেই বুঝায়।

লয়—সঙ্গীতের গতি বুঝাইতে লয় বুঝায়। সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হয়েছে "ক্রিয়ান্তর বিশ্রান্তিলয়ঃ, অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্তে যে বিশ্রান্তি ঘটে তাহাই লয়।

প্রস্তার—ইহার অর্থ বিস্তার। তালকে বিভিন্ন ভাবে বিস্তার করাকে প্রস্তার বলে।

যতি—তাল শাস্ত্রে গতি প্রয়োগের নিয়মকে যতি বলা হয়েছে। যতি পাঁচ প্রকার। যথা—সমা, স্রোতাগতা, বা (সরিৎ), গোপুচ্ছা, মৃদঙ্গ, পিপীলিকা অথবা ডমরু।

স্রোতাগতা—আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে দ্রুত গতির সমাবেশ থাকিলে স্রোতাগতা যতি বলে।

গোপুচ্ছা—গতি সমাবেশ দ্রুত থাকিলে অন্তে বিলম্বিত গতির সমাবেশ থাকিলে তাহা গোপুচ্ছা যতি।

মৃদঙ্গ—আদি অন্তে দ্রুত, এবং মধ্যস্থানে মধ্য ও দ্রুত গতির মিশ্রণ থাকিলে মৃদঙ্গ যতি বলা হয়।

ডমরু—আদি অন্তে বিলম্বিত ও মধ্য স্থানে দ্রুত গতির ক্রিয়া হইলে তা'কে পিপীলিকা বা ডমরু যদি বলে।

তবলার উৎপত্তি

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও কবি আমীর খস্রু আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে রাজমন্ত্রী ছিলেন।

আমির খস্রুর পিতা সফিউদ্দীন, চেংগিস খাঁ মতান্তরে খিজির খাঁর অত্যাচারে তুর্কীস্থান থেকে পালিয়ে এসে পাঞ্জাবের পাতিয়ালা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১২৫২-৫৩ খৃঃ অঃ খস্রু এটা জেলার অন্তর্গত পাতিয়ালী (অন্য-মতে হিজরী জেলার অন্তর্গত টিয়ালী গ্রাম) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ এই গ্রামের নাম বতিয়ালী বা মমিনাবাদ বলে থাকেন। কথিত আছে বাঁয়া-তবলা তাঁহারই সৃষ্টি। তার আগে

মৃদংগ যন্ত্রই ব্যবহৃত হ'তো। আমীর খস্রু মৃদংগকে দু'ভাগে ভাগ করে, তারই অনুকরণে তবলা ও ও বাঁয়া সৃষ্টি করেন, তার বাজনায় মৃদংগের বোলই একটু শ্রুতিমধুর করে নেওয়া হয়। এই বাঁয়া ও তবলা সারা ভারতে সমাদর লাভ করেছে। বর্ত্তমানে এই তাল বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ও প্রচলন বেড়ে চলেছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর নশ্বর দেহ দিল্লীতে তারই গুরু নাজিমুদ্দীন ওয়ালিয়ারের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়।

তবলা, পাখোয়াজ ও খোল-এর বিবরণ।

তবলা—তবলা মূখ্যতঃ দু'টি যন্ত্রের সমন্বয়। যে যন্ত্রটিকে ডান হাতে বাজান হয় তাকে বলা হয় ডাইনা এবং যে যন্ত্রটিকে বাম হাতে বাজান হয় তাহাকে বলা হয় বাঁয়া।

সাধারণতঃ ডাইনাটাকেই তবলা বলা হইয়া থাকে। ডাইনার প্রধান অংশটুকু তৈয়ারী হয় আম, নিম, শিশু, চন্দন, জাতীয় কাঠ দিয়ে। এর আকৃতি অনেকটা শঙ্খের মত। নীচের দিকে চওড়া এবং ওপরের দিকে ক্রমশ সরু। ওপর এবং নীচের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় দুই ইঞ্চি তফাৎ থাকে। অর্থাৎ নীচের ব্যাসার্দ্ধ যদি হয় সাত ইঞ্চি তাহা হইলে ওপরের ব্যসার্দ্ধ হয় পাঁচ ইঞ্চি। কাঠের গোলাকার এ অংশটিকে লকড়ী বলে। প্রয়োজন মত মুখ থেকে একটি গর্ত করে ভিতর থেকে কুদে কাঠ বের করে নেওয়া হয়। ডাইনার মুখটি চামড়া দিয়া ছাউনি করা হয়। ছাউনির ধার ঘেঁসে একটি চামড়ারই পটি থাকে, একে বলা হয় কানি। ছাউনির ঠিক মাঝখানে থাকে গাব বা স্যাহী, এটি একটি কালো প্রলেপ। ছাউনির একেবারে বাইরের দিকে ছাউনিকে ঘিরে মোটা আকেস্টন থাকে' তাকে বলা হয় পাগড়ী। লকড়ীর ঠিক নীচে একটা বিঁড়ের মত অংশ থাকে, তাঁকে গুঁড়রী বলে। ছাউনির পাগড়ী ও লকড়ির গুড়রির মধ্যে

চামড়ার লম্বা ছোট্ দিয়ে ঠিক দড়ির মত লকড়ির সঙ্গে ছাউনিটিকে বেঁধে রাখা হয়। সুর বাঁধার জন্য ঐ ছোট্‌গুলো এবং লকড়ীর মধ্যে কতগুলো কাঠের পিপের মত গুলি ঢোকানো থাকে। এই গুলি-গুলোকে উঠিয়ে বা নাবিয়ে তবলার সুর বাঁধা হয়।

বাঁয়াটিও তবলার মতই বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরী। এর লকড়ীটি যাকে এর বেলায় বলা হয় কুঁড়ী, তৈরী হয় মাটি বা তামা দিয়ে। এছাড়া; ডাইনার চেয়ে এর ব্যাসার্দ্ধ হয় বড় কিন্তু উচ্চতা কম। ডাইনার যেমন সুর বাঁধার জন্য গুলি থাকে। এতে তার প্রয়োজন হয় না। বাঁয়ার গাবটিও ঠিক মাঝখানে না থেকে একটু পাশে থাকে।

পাখোয়াজ

আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটিই সবচেয়ে প্রাচীন। পাখোয়াজের অঙ্গটি তৈরী হয় কাঠ দিয়ে। এর আকার তিন রকমে হয়—যবাকৃতি, গোপুচ্ছাকৃতি এবং হরীতকী আকৃতি। পাখোয়াজের দুই দিকেই খোদাই করা থাকে অর্থাৎ এটাকে চোঙের মত তৈরী করে নেওয়া হয়। দুটো খোলা মুখেই ছাউনি থাকে। বাঁ দিকের তুলনায় অন্যদিকের মুখটা একটু ছোট। দু'দিকের মুখের ছাউনিকেই তাদের পাগড়ীর সঙ্গে ছোট্ দিয়ে একটিকে অন্যটির সঙ্গে টেনে রাখা হয়। সুর বাঁধার জন্য ছোট্ ও পাখোয়াজের কাঠের মাঝখানে কাঠের গুলি দেওয়া থাকে। পাখোয়াজের ডানদিকের ছাউনিতে গাব থাকে এবং বাঁ ছাউনিটি সাদা। বাজাবার সময় বাঁ দিকের ছাউনিতে আটা বা কাঁচা মাটি লাগিয়ে বাজান হয়। পাখোয়াজের আওয়াজ গম্ভীর প্রকৃতির। ধ্রুপদ অঙ্গের গানের সঙ্গেই যন্ত্র বাজান হয়ে থাকে।

খোল

খোল যন্ত্রটি পাখোয়াজেরই একটি রূপান্তরিত সংস্করণ। এই যন্ত্রের আকৃতি ঠিক পটলের মত। এর অঙ্গটি তৈরী হয় মাটি

দিয়ে। প্রথমে কাঁচা মাটি দিয়ে অঙ্গটি তৈরী করে, তাকে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হয়। যাতে সহজে ভেঙ্গে না যায় সেইজন্য সমস্ত অঙ্গটি চামড়ার সরু সুতো দিয়ে জড়ানো থাকে। খোলের বাঁদিকের মুখটি বড় এবং ডানদিকের মুখটি ছোট, স্বভাবতই ডান দিকের মুখের আওয়াজ চড়া। দু'দিকের ছাউনিকেই মোটা এবং শক্ত ছোট্ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এতে পাখোয়াজ ও তবলার মত গুলি থাকে না। এ কারণে খোলের সুর বাঁধারও কোন অসুবিধা নাই। এই যন্ত্র সাধারণতঃ কীর্তন ও পল্লীগীতির সাথেই বাজান হয়। বাংলা দেশ এবং বৃন্দাবনেই এই যন্ত্রের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই এ যন্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং এক কথায় বলা যেতে পারে যে পাখোয়াজের গ্রামীন সংস্করনই হচ্ছে খোল।

ভারতীয় নৃত্যবিদ্ ও শিল্পীদের পরিচিতি

ঠাকুর প্রসাদ

পরম কৃষ্ণভক্ত নৃত্য সাধক ঈশ্বরী প্রসাদের ইনি প্রপৌত্র। ঠাকুর প্রসাদের পিতার নাম প্রকাশজী যিনি প্রথম লক্ষ্ণৌতে যান এবং নবাব আসাফ উদ্দৌলার দরবারে কলাকার রূপে নিযুক্ত হন। প্রকাশজীর তিন পুত্রের ভিতর ঠাকুর প্রসাদজী ওয়াজিদ আলি শাহের সভানর্তক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন। ঠাকুর প্রসাদ স্বকীয় প্রতিভায় অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেন। ঠাকুর প্রসাদের নৃত্যের নানা চমকপ্রদ উল্লেখ পাওয়া যায়। ঠাকুর প্রসাদের "গণেশ পরণ" দেখে দর্শকেরা স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। প্রবাদ আছে—গুরু দক্ষিণা স্বরূপ নবাব তাঁকে ছয় পাল্‌কী অর্থ প্রদান করেন। ১৮৫৬ খৃঃ তিনি পরলোকগত হন।

বিন্দাদীন মহারাজ

ইনি উচ্চবংশীয় কথকি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সময়কাল আনুমাণিক ১৮২৯ সাল। এলাহাবাদের হাঁড়িয়া

তহসীলে ইঁহারা বংশ পরম্পরায় বাস করিয়া আসিতে ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এই বংশে নৃত্য চর্চা শুরু হয়। বিন্দাদীন মহারাজের পিতামহ শ্রীপ্রকাশজী প্রথমে লক্ষ্ণৌতে বসবাস করিতে আসেন। ইঁহার তিন পুত্র—দূর্গা প্রসাদজী, ঠাকুর প্রসাদজী ও মানসিংহজী। দূর্গা প্রসাদজীর পুত্রই মহারাজ বিন্দাদীন। বিন্দাদীন মহারাজ নৃত্যশিক্ষা করেন ঠাকুর প্রসাদজীর কাছে। ঠাকুর প্রসাদজী ছিলেন অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের সভানর্ত্তক ও নৃত্য গুরু। বিন্দাদীন মহারাজ ভারতবিখ্যাত পাখোয়াজী কুদউসিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া নৃত্য প্রদর্শন করেন নবাবের দরবারে এবং বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিন্দাদীন মহারাজ লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলে যান এবং বিদ্রোহের অবসানে আবার ফিরিয়া আসেন। ভূপালের নবাব এবং নেপালের মহারাজা বহু ধনসম্পত্তি দিয়া এঁদের সাহায্য করেন। প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হইয়াও ইনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন। বিন্দাদীন মহারাজ কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। তিনি বহু ঠুংরী, গীত ও ভজন রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালীন লক্ষ্ণৌর বহু বিখ্যাত বাঈজী তাঁহার নিকট নৃত্য শিক্ষা করিতেন। বিন্দদীন মহারাজ অপুত্রক ছিলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার তিন পুত্রকে নৃত্য শিক্ষা দিয়া বংশে নৃত্যের ধারা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। আনুমানিক ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিন্দাদীন মহারাজ পরলোক গমন করেন।

উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্কর উদয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্যই তাঁহার নাম উদয়শঙ্কর রাখা হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি কলারসিক ছিলেন। তাঁহার পিতা ব্যারিষ্টার শ্যামশংকর চৌধুরী

সে সময় ঝালোরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অতি অল্পবয়সেই উদয়শংকর চিত্রাঙ্কন ও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন; ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বোম্বাই-এর জে. জে. স্কুল অব আর্টসে ভর্তি করিয়া দেন। পরে উদয়শংকর বোম্বাই-এর গান্ধর্ব বিদ্যালয়েও সংগীত শিক্ষা করেন। ইহার পরে তিনি লণ্ডনের রয়েল স্কুল অব আর্টসে ভর্তি হন। ঐ স্কুলে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও দুইটি পদক "স্পেনসার" ও "জর্জক্লসেন" লাভ করেন। পরে বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যালে নর্তকী আনা পাভলোভার সহিত সাক্ষাত হয় ও পাভলোভার নৃত্য সহচর হন এবং তাঁহার দলের সহিত বিভিন্ন দেশে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া প্রচুর খ্যাতি ও অর্থলাভ করেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আলমোড়াতে "উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার" নামে একটি নৃত্যশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই প্রতিষ্ঠানে উদয়শঙ্করের নৃত্য গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রিপাদ নৃত্যশিক্ষা দিতেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

উদয়শঙ্কর বহুবার আপনার দল লইয়া নৃত্য প্রদর্শনার্থে বিদেশে গিয়াছেন এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরগুলিতে নৃত্য কৌশল প্রদর্শন করিয়া প্রভূত প্রখ্যাতি লাভ করেন। এই দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য সঙ্গীত শিল্পী সর্ব্বশ্রী তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালী, নৃত্যশিল্পী কণকলতা, অপরাজিতা নন্দী ও ফরাসী শিল্পী মাদাম সিমকী প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের অন্যতম গুণী সঙ্গীতার্য উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবও উদয়শংকরের সঙ্গে বিদেশে ভ্রমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি অমলাশঙ্করও খ্যাতনাম্নী নৃত্য শিল্পী। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়া ভারতীয় নৃত্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও কয়েকটি বিদেশী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। এত যশ, সম্মান এবং অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং সরল। তাঁহার

নিরহঙ্কার আচার ব্যবহার হইতে তাঁহার প্রকৃত শিল্পী সুলভ মনের পরিচয়টি পাওয়া যায়।

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী

ইনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই-তে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীনীলকণ্ঠ শাস্ত্রী (নীলকান্ত)। ইনি মাদ্রাজের চিরসমুলর নামক স্থানে বাস করিতেন এবং তিনি সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন; শুধু তাহাই নহে—তিনি সংস্কৃতের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই নৃত্যগীতের প্রতি রুক্মিণী দেবীর প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। ১৯২০ খৃঃ ডক্টর জর্জ, এস অরুণ্ডেল-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রুক্মিণী দেবীর স্বামীও একজন কৃতিবিদ্য পুরুষ ছিলেন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত রুশীয় নর্তকী শ্রীমতি অ্যানা পাভলোভার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আনা পাভলোভার নিকট তিনি উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট নৃত্যশিক্ষা শুরু করেন। ১৯২৪ খৃঃ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরিয়া শ্রীমীনাক্ষীসুন্দরমের নৃত্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভরতনাট্যমের তালিম নেন। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তিনি মীনাক্ষী সুন্দরমের যোগ্য শিষ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরে তিনি সুপ্রসিদ্ধ নর্তকী ব্রহ্মশূয়ী পাপনাশন শিবমের নিকটে ভরত নাট্যম নৃত্য শিক্ষা করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের নিকটবর্তী অডিয়ার-এ "কলাক্ষেত্র" নামে একটি কলাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। "কলাক্ষেত্রের" উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের বিস্মৃতপ্রায় নৃত্যধারার পুনরুজ্জীবন। ঐ বছরেই তিনি "ইন্দোর ন্যাশনাল একাডেমী অব আর্টসে" অধ্যক্ষা পদে নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল রাজ্যপরিষদের সদস্যও ছিলেন। ১৯৩৬ খৃঃ তিনি দক্ষিণ

ভারতে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তিনি তাঁহার অপরূপ নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। ১৯৫৩ খৃঃ তিনি নৃত্য প্রদর্শনের জন্য আমেরিকায় যান। সেখানে অজস্র খ্যাতি অর্জন করেন এবং "কলাক্ষেত্রে"র জন্য প্রচুর অর্থও সংগ্রহ করেন। রুক্মিণী দেবীর নৃত্য ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৬ সালে রুক্মিণী দেবী স্বর্গীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্ত্তৃক "পদ্মভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি রুক্মিণী দেবীর প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার নৃত্য-কলায়। তাঁহার নৃত্য বস্তু প্রধানতঃ ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মশাস্ত্রের পটভূমিতে রচিত। ভারতীয় নৃত্যকলার গবেষণা, প্রচার ও প্রসার কল্পে তাঁহার যে অবদান ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শম্ভু মহারাজ

ইনি এলাহাবাদের হাঁড়িয়া তালুক নিবাসী ঈশ্বরজীর বংশধর শ্রীকালিকা মহারাজের (কালিকা প্রসাদের) কনিষ্ঠ পুত্র এবং লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ বিন্দাদীন মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবে ইনি জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে কথক নৃত্য শিক্ষা করেন। পরে অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পরে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত অচ্ছান মহারাজের নিকটে নৃত্যশিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী লাভ করেন। ইনি সংগীতেও বিশেষ পারদর্শী এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সমকক্ষ হইবার যোগ্যতা ছিল। ইনি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মৈনুদ্দিন সাহেবের বংশধর রহিমুদ্দিন সাহেবের কাছে নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। কথক নৃত্যের 'ভাও' বা অভিনয় শম্ভু মহারাজের অতি উচ্চাঙ্গের। ইনি উচ্চাঙ্গ নৃত্য প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করিয়াছেন এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন। ইনি দিল্লীতে "ভারতীয় কলাকেন্দ্রে" নৃত্য বিভাগের আচার্য্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি কথক নৃত্যকে

"নটবররী নৃত্য" আখ্যা দিয়াছেন। ১৯৭০ সালের ৪ঠা নভেম্বর ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

অচ্ছান মহারাজ

ইনি বিন্দাদীন মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাল্‌কা মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইঁহার প্রকৃত নাম জগন্নাথ প্রসাদ। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে নৃত্যশিক্ষা লাভ করিয়া ইনি দেশে-বিদেশে কথক নৃত্য দেখাইয়া সুনাম অর্জন করেন। ইনি বহুদিন রামপুর রাজদরবারে ছিলেন। অচ্ছান মহারাজের ভাও অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছিল। তাঁহার তাল-লয়ের কাজ এত সূক্ষ্ম ছিল যে বিখ্যাত তবলাবাদকদিগকেও অনেক সময়ে অসুবিধায় পড়িতে হইত। অচ্ছান মহারাজ শৃঙ্গার, ক্রোধ, বাৎসল্য ও শান্ত-রসের ভিত্তিতে অনেক গৎভাও তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন—'মাখন চুরি, কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, গাগরী ভরণ' ইত্যাদি। অচ্ছান-মহারাজের তিন কন্যা ও সুপুত্র বিরজু মহারাজ আজ ভারত বিখ্যাত। আনুমানিক ১৯৪৪ সালে অচ্ছান মহারাজের দেহবসান হয়।

শ্রীসুন্দর প্রসাদজী

ইনি জয়পুর ঘরাণার বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ স্বর্গত জয়-লালজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা চুনীলালজী ও ভ্রাতা জয়লালজীর কাছে ইনি নৃত্যশিক্ষা করেন। পরে ইনি বিন্দাদীন মহারাজের কাছে নৃত্যশিক্ষা করিয়া আপন সাধনার দ্বারা জয়পুরী ঘরাণার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার খুল্লতাত দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাকে সযত্নে নৃত্যশিক্ষা দিয়াছিলেন। আপনার পারিবারিক গুরুদের নিকট হইতে জয়পুরী ঘরাণার নৃত্যশিক্ষা করেন এবং বিন্দাদীন মহারাজের নিকট হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ ঘরারাণার তালিম নেন। এইরূপে তিনি উভয় ঘরাণার নৃত্যেই পারদর্শীতা লাভ করেন। পরে তিনি পরীক্ষা

মূলকভাবে জয়পুর ঘরাণা ও লক্ষ্ণৌ ঘরাণার নৃত্যধারা দুইটিকে মিলাইয়া একটি নূতন ধারার সৃষ্টি করেন, যাহাতে উপরোক্ত দুটি ঘরাণার বিশেষত্বই বজায় রহিয়াছে। ২০ বৎসর বয়সেই বিভিন্ন স্থানে কথক নৃত্য প্রদর্শন করিয়া ইনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ইহার পরে নৃত্যকলাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে শিক্ষক রূপেও তাঁহার নৈপুন্য প্রকাশ পায়। বোম্বাইতে তিনি "মহারাজ বিন্দাদীন স্কুল অব কথক" নামে একটি শিক্ষা সংস্থা স্থাপন করেন এবং কৃতিত্বের সহিত অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তৈরী করেন। বহুদিন বোম্বাইতে থাকার পর ১৯৫৮ সালে তিনি যোগদান করেন দিল্লীস্থিত "ভারতীয় কলাকেন্দ্রে" এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই সংস্থার সহিতই যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "পদ্মশ্রী" উপাধিতে বিভূষিত হন। কিছুকাল ক্যানসার ও হৃদরোগে অসুস্থ থাকার পর ২৮শে মে, ১৯৫৯ সালে তিনি দিল্লীতে দেহত্যাগ করেন। তিনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন; মহারাজ বিন্দাদীনের পূজা না করিয়া তিনি কোন কাজ আরম্ভ করিতেন না। ইহার সুবিখ্যাত শিষ্য-শিষ্যাদিগের মধ্যে কল্যান পুরকর, মোহনলাল, মৃণালিনী দেবী, মেনকা দেবী, রোশন কুমারী, হীরালাল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কালকা মহারাজ

স্বর্গত দুর্গাপ্রসাদজীর তিনপুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র কালিকা প্রসাদজীই কাল্‌কা মহারাজ নামে খ্যাত। ইনি বিন্দাদীন মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কাল্‌কা মহারাজ নৃত্যে ও তবলা বাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাল্‌কা মহারাজের তিন পুত্রই ভারত বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী—অচ্ছান মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজ। অচ্ছান মহারাজ ও শম্ভু মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন। লচ্ছু মহারাজ বোম্বাইতে চিত্র জগতে নৃত্য গুরু হিসাবে বিরাজ করছেন।

শ্রীবিরজু মহারাজ

লক্ষ্ণৌর বিখ্যত কাল্‌কা মহারাজের পৌত্র শ্রীব্রিজমোহন বা বিরজু মহারাজ আজ ভারতবিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী। ইনি শৈশবে পিতা অচ্ছান মহারাজের নিকট নৃত্যশিক্ষা করেন ; পরে ১০ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজের নিকটে নৃত্যশিক্ষা করিয়া কথক নৃত্যে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। তবলা ও পাখোয়াজ বাদনেও বিরজুমহারাজ বিশেষ দক্ষ। কথক নৃত্যের বিশেষ আঙ্গিক রচনায় বিরজু মহারাজের অবদান অবিস্মরণীয়। ইনি ফাগলীলা, গোবর্দ্ধনলীলা, কুমারসম্ভব, মালতী মাধব প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীকে কথকের আঙ্গিকে ব্যালে রূপদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি দিল্লীতে "ভারতীয় কলাকেন্দ্রে" কথক নৃত্যের অধ্যাপনা করিতেছেন।

৺জয়লালজী

স্বর্গত জয়লালজী জয়পুর ঘরানার বিশিষ্ট শিল্পী চুনীলালজীর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইনি ইংরাজী ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে পিতা চুনীলালজীর নিকট নৃত্যশিক্ষা করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইনি লক্ষ্ণৌ ঘরাণার শিল্পী বিন্দাদীন মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জয়লালজী বহুবৎসর জয়পুর দরবার ও রায়গড় দরবারের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইনি শুধুমাত্র দক্ষ নৃত্য-শিল্পীই ছিলেন না—সঙ্গীতে এবং তবলা বাদনেও পারদাশতা অর্জন করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং ১৯৪৩ সালে কেহ কেহ বলেন ১৯৭৯ সালে পরলোকগমন করেন। জয়লালজীর একমাত্র পুত্র রাম গোপাল ও কন্যা জয়কুমারী সাম্প্রতিক কালে নৃত্যশিল্পীরূপে ভারত বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীরাম-গোপাল ইদানীং কলিকাতায় বহু নৃত্যপ্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। জয়কুমারী কয়েক বছর আগে স্বর্গতা হয়েছেন।

শ্রীগোপীকিষান

ইনি নেপাল দরবারের স্বর্গত গায়ক শ্রীশুকদেব মিশ্রের দৌহিত্র। ইঁহার মায়ের নাম শ্রীমতী তারা দেবী। ইনি শৈশবে মাতামহের নিকটে নৃত্যশিক্ষা করেন এবং কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া সুনাম অর্জন করেন। একবার 'যুগান্তরে'র পাততাড়ির বার্ষিক অনুষ্ঠানে ত্য প্রদর্শন করিয়া ইনি কলারসিক সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। গোপীকিষাণ পরে আপন মাসীদের নিকট ও শম্ভু মহারাজের নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজ শিক্ষাকে আরও দৃঢ় করেন। মাতামহের সহিত বোম্বাইতে গিয়া "ঝনক্ ঝনক্ পায়েল বাজে" নামক একটি চলচ্চিত্রে নৃত্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া সারাভারতের দর্শক সমাজের চিত্তজয় করেন ও বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীদের নামের তালিকায় আপনার নাম যুক্ত করেন। ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া ইনি আপনার সুনাম অক্ষুন্ন রাখেন। বর্ত্তমানে ইনি বোম্বাইতে অবস্থান করিতেছেন এবং চলচ্চিত্রে নৃত্য পরিচালকরূপে কাজ করিতেছেন। শুধুমাত্র কথকে দক্ষতা লাভ করিয়াই ইনি সন্তুষ্ট হন নাই ;—মণিপুরী, ভরতনাট্যম্ এবং অন্যান্য ভারতীয় নৃত্যেও কুশলতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

সীতারা দেবী

ইনি ১৯০৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। নেপাল দরবারের নৃত্যগুরু ৺শুকদেব মিশ্রের কন্যা সীতারা দেবী নৃত্যশিল্পী ও চলচ্চিত্র তারকা রূপে ভারত বিখ্যাত। অলকানন্দা দেবী এবং গোপীকিষানের মাতা তারা দেবী ইঁহার ভগ্নী। ইঁহার পিতা ছিলেন বেনারস ঘরাণার বিখ্যাত নৃত্যবিদ্। বাল্যকালে আপন পিতার নিকটেই ইনি প্রথম নৃত্যশিক্ষা করেন। ১২/১৩ বৎসর বয়সে ইনি শম্ভু মহারাজের সান্নিধ্যে আসেন এবং ইঁহার নিকট

হইতে নৃত্যশিক্ষা করেন। পরে লচ্ছু মহারাজের নিকটেও ইনি তালিম নেন। কথক ছাড়া মণিপুরী, ভরতনাট্যম্‌, লোকনৃত্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যেও তিনি কুশলী। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং পশ্চিমের দেশগুলিতে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি অশেষ সুনাম ও যশ লাভ করিয়াছেন। চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রূপেও তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। চিত্রপরিচালক শ্রীআসিফের সহিত তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানে বোম্বাইতে আছেন।

শ্রীমণি বর্ধন

ত্রিপুরা জিলা, বর্ত্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত কাদৈর গ্রামে ১৯০৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এই শিল্পীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৺রজনী কান্ত বর্ধণ কুমিল্লায় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। ঈশ্বর পাঠশালা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ১৯২৮ সালে স্নাতক পরীক্ষায় (বি. এ.) সাফল্য অর্জ্জন করেন। কলিকাতায় আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসে তিনি সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। অধ্যয়নের পরিবর্তে তিমির বরনের বাদ্যবৃন্দে (orchestra) যোগদান করেন। তিনি সেখানে বাঁশী বাজালেও সেতার ও বেহালায় তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। ইতি মধ্যে তিনি দক্ষিন ভারত পরিভ্রমণ করে সেখানকার দেব-দাসীদের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। তারপর নৃত্যকে অভিজাত মহলে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করাবার বাসনা তাঁর মনে জাগে। এরপর ১৯৩১ সাল থেকে তিনি একনিষ্ঠ ভাবে শুধু নৃত্য চর্চায় মনোনিয়োগ করেন নি জাতীয় পাঠাগারে (National Library) নৃত্য বিষয়ে অধ্যায়ন শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে নৃত্য সম্প্রদায় গঠন করে বাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। বিশুদ্ধ ভাবে মনিপুরী নৃত্যে সুষমা সম্বন্ধে মনিপুরবাসীকে সচেতন করেন। একজন ভারতীয় নৃত্যবিদ্‌ হিসাবে

তিনি নৃত্য শিক্ষার জন্য প্রথম মনিপুর যান। তিনি যাদের কাছ থেকে বিভিন্ন নৃত্য বিষয় শিক্ষালাভ করেন, সেই সকল নৃত্য বিষয় সহ তাঁদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

গুরুর নাম	নৃত্যের বিষয়
পথমল (মাদ্রাজ)	ভরতনাট্যম্
আমুবী সিং কুলু বিধু খৈ মুচা	মনিপুরী
সাতারামজী মিনা বক্স	কথক
নায়ার	কথাকলি
মাস্তাদজেব	জাভানিজ্ নৃত্য
রত্না এ্যাইসাহ দেবীজা	বালী „
মমিয়া আনচি	বর্মিজ „
মিঃ মাকী	জাপানী „

১৯৩৭ সালে সর্ব ভারত পরিভ্রমন করেন। তিনি পাটনা, এলাহবাদ, ঝাঁসী, জব্বলপুর, মিরাট, দিল্লী ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে তাঁর সংরচিত বৃহন্নলা (জাভানিজ শৈলী) শিবনৃত্য (ভরতনাট্যম্ শৈলী), রুদ্রদেব, সোন্দেব নৃত্য, চণ্ডাসুর, ভারত তীর্থ, রাজপুত্তুর প্রভৃতি প্রদর্শন করে, প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনের (Music Conference) নিমন্ত্রিত হয়। পরে নিখিল-ভারত সংগীত সম্মিলনের পরিচালক মণ্ডলীর সভ্যরূপে মনোনীত হয়েছিলেন। আকাশ বাণী কলিকাতা কেন্দ্রে নৃত্য সম্বন্ধীয় তাঁর বহু কথিকা প্রচারিত হয়েছে। তিনি Statesman, অমৃত বাজার যুগান্তর, আনন্দ বাজার, প্রবাসী ও বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় নৃত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। নিউ থিয়েটার ও অন্যান্য স্টুডিওতে

নৃত্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার পরিবেশিত "নীলবর্ণ শৃগাল কথা" চলচ্চিত্র তাঁরই পরিকল্পনায় সংরচিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে বিশেষ অধিকর্তা হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে লোকনৃত্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁর রচিত "বাংলার লোকনৃত্য গীতিবৈচিত্র" সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বই আছে। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের কলা বিভাগের সহকারী অধিকর্তা হিসাবে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে "প্রয়োগ-বিজ্ঞান ও নৃত্য নবাংগ (নৃত্য-ব্যাকরণ) ও গৌড়ীয় শৈলী" প্রভৃতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নৃত্য শিক্ষায়তন "ছন্দম্" বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। এখনও তিনি নৃত্য গবেষণায় রত থেকে তাঁর সংগীত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সংগীত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

শংকরণ নমবুদ্রীপাদ

কথাকলি নৃত্যগুরু শংকরন নমবুদ্রীপাদ। ত্রিবাংকুরের এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। বেদ ও ধর্মগ্রন্থাদিতে তিনি যেমন সুপণ্ডিত, সংগীতে—বিশেষত কথাকলি নৃত্য ও অভিনয়ের প্রতিও তাঁর ছিল তেমনি অখণ্ড অনুরাগ।

সে সময়ে মালাবারের কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে নৃত্য শিক্ষার প্রচলন ছিল না। একাজ তখন অত্যন্ত দোষণীয় মনে করা হত। তাই শংকরন গোপনে কথাকলি নৃত্য শিক্ষা আরম্ভ করেন। ঘটনা-চক্রে একদিন তিনি পিতার নিকট ধরা পড়ে যান। পিতাও সংগীতানুরাগী ছিলেন, তাই পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ভালো-ভাবে তাঁর নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন, পনের বছর নিরলস সাধনা করে নমবুদ্রীপাদ এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

ত্রিবান্দ্রমে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উদয় শংকরের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

প্রথম দর্শনেই রতনে রতন চিনে ফেললেন। পরে উদয়শংকর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেছিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কথাকলি নৃত্য নাট্য দলের সঙ্গে শংকরন সারা উত্তর ভারত পরিভ্রমন করে প্রভুত যশ খ্যাতি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শংকর তাঁকে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায় কথাকলি নৃত্য ও অভিনয়ের অধ্যাপক হিসেবে। এই সহৃদয় ও নিরহঙ্কার ব্যক্তিটি উদয় শংকরকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন।

শংকরন ছিলেন ষোল আনা সংগীত প্রাণ। কট্টর ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও,—নিজে শুদ্ধাচারী সাত্বিক ব্রাহ্মণ হওয়াও সত্বেও, সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জাতিধর্ম ভেদাভেদের অনেক উর্ধ্বে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলমোড়ায় উদয় শংকর ইণ্ডিয়া কাল্‌চার সেণ্টারে গিয়ে শংকরন নটরাজের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবকে (সে সময় খাঁ সাহেব ঐখানেই থাকতেন) তিনি অনুরোধ জানালেন তাঁর প্রিয়তম ইষ্ট দেবতা নটরাজকে সরোদ শোনাবার জন্য। নিরভিমানী খাঁ সাহেব সানন্দে সম্মত হলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরোদ নিয়ে হাজির হলেন মন্দিরের সামনে। শংকরন তাঁকে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে নটরাজের সামনে বসতে বললেন। খাঁ সাহেব এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি নন। বল্লেন,—আমি মুসলমান, হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করার স্পর্দ্ধা বা সাহস আমার নেই। নমবুদ্রীপাদ তাঁকে বোঝালেন:—এই ভেদাভেদ মানুষের সৃষ্টি। তারজন্য দেবতাকে দায়ী করে তাঁকে এই অনুপম সংগীত সুধা থেকে বঞ্চিত রাখা কি উচিত? নটরাজের সামনে বসে বাজালে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।··· এই ভাবে অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে অবশ্য খাঁ সাহেব মন্দিরাভ্যন্তরে বসেই পরম তৃপ্তিভরে নটরাজকে সংগীত শুনিয়েছিলেন।

কুশল অভিনেতা শংকরন যেমন আজীবন নৃত্যনাট্যের সেবাতেই

আত্মনিয়োগ করেছিলেন তেমনি তাঁর শেষ জীবনেরও অবসান ঘটেছিল নাটকীয়ভাবে।

আলমোড়া কেন্দ্রে সেদিন অভিনীত হচ্ছিল "দুশাঃসন বাধম্"। প্রায় তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ নমবুদ্রীপাদ সবেমাত্র একটি দৃশ্যের অভিনয় শেষ করে এসে প্রবেশ করলেন প্রেক্ষাগৃহে। এখুনি তাঁর প্রিয় শিষ্য উদয় শংকর ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। পরমাগ্রহে সেই দৃশ্য উপভোগের জন্য এসে বসলেন আসনে। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ইন্দ্ররূপী উদয় শংকর মঞ্চে এসে নৃত্য আরম্ভ করবেন, এমন সময় শংকরন তাঁর আসনের ওপর ঢলে পড়লেন। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে পেক্ষাগৃহের বাইরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগলেন। বেশভূষা সমেত উদয়শংকরও ততক্ষনে ছুটে এসেছেন গুরুর কাছে। আতঙ্ক বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরলেন গুরুর দেহ। কিন্তু শিষ্যের উষ্ণ স্পর্শ পাবার অনেক আগেই প্রস্থান করেছেন অমর লোকে।

বালা সরস্বতী

ভরতনাট্যমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতি বালা সরস্বতী। নৃত্যগীতেও অভিনয়ে ইনি সমান পারদর্শী। রাগ সংগীতে নিপুন, কণ্ঠ সুষমায় সমৃদ্ধ ও অভিনয় দক্ষ এরূপ নৃত্য শিল্পী সচরাচর দেখা যায় না।

এই গুণ ইনি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলেন। তার মা জয়ম্মল বা জয়ম্মাও (১৮৯০-১৯৫৯ খৃঃ) নিপুন নৃত্যগীত পটিয়সী ছিলেন। মাতামহী বীণা ধনম্ (১৮৬৭-১৯৩৮ খৃঃ) ছিলেন তৎকালীন খ্যাতনাম্নী বীণাবাদিনী ও গায়িকা। প্রমাতামহী সুন্দরম্মল ছিলেন তাঞ্জোর দরবারের রাজনর্ত্তকী। এইভাবে বংশ পরম্পরায় এঁরা ছিলেন সংগীত প্রাণ। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তদানীন্তন দেবদাসী পরিবারে বালা সরস্বতীর জন্ম।

বালা সরস্বতীর সংগীত শিক্ষারম্ভ হয় চার-পাঁচ বছর বয়সে গুরু কণ্ডপ্‌পন-এর (১৮৯৯-১৯৪১ খ্রীঃ) কাছে। তাঁর পরবর্ত্তী গুরুদের নাম গৌরী অম্মল, চিন্নইয়া নায়ডু ও কুচীপুড়ি বেদান্তম্‌ লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী। মাত্র ছ'সাত বছর বযসে বালা কঞ্চীভরমের 'অমনাক্ষী অম্মন মন্দিরে' "অরঙ্গট্রম" নৃত্য প্রদর্শণ করে উপস্থিত গুণী সংগীতজ্ঞ ও সুধীজনদের চমৎকৃত করেছিলেন।

তখনো পর্যন্ত বৃত্তিভোগ নর্তকীদের, সমাজ খুব সুনজরে দেখত না। এখনকার মত তখন, এই নৃত্য প্রদর্শনের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাই বালা সরস্বতীর নৃত্যানুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্য পরিচালনায় কিছুটা সংস্কার করা হল। কণ্ডপ্‌পন ছিলেন এই ব্যবস্থার পুরোভাগে।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের প্রচেষ্টায বারণাসীতে অনুষ্ঠীত ।নখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলনে নৃত্য প্রদর্শন করে বালা প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই আসরে ছিলেন বলে জানা যায। এবপরেই তিনি দেশ-বিদেশে তাঁর সাংস্কৃতিক অভিযান আরম্ভ করেন। ১৯৬১ খ্রীঃ তিনি জাপানে (টোকিও) অনুষ্ঠিত পূর্ব্ব-পশ্চিম সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ আমেরিকায যান। ভারত সরকার কর্ত্তৃক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও 'পদ্মভূষণ' দিযে তাঁকে সম্মানিত করা হয।

শ্রীমতি বালা সরস্বতীর 'বর্ণম্‌' (নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের সমন্বয়) ও 'পদম্‌' (শৃঙ্গার রসাত্মক ভাবব্যঞ্জনা যুক্ত অভিনয়) ছিল খুব বিখ্যাত। তাঁর আবেগমধুর নৃত্য নৈপুণ্য যাঁরাই প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই জানেন, তিনি কত উঁচু দরের শিল্পী। আমেরিকায় এক সংগীত সমালোচক বলেছিলেন, বালা সুন্দরী নন, কিন্তু তাঁর প্রথম মুদ্রাই রঙ্গমঞ্চের রূপ বদলে দেয এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও সমর্পণের ভাবটি মূর্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীমতি এখন শ্রীনানজুনডিয়ারের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।

শ্রীমণিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

গত ২৩শে বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দ, ইং ৬ই মে, ১৯১৪, খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জিলার পাঁচথুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ৺বিনোদ মোহন চক্রবর্ত্তী। তিনি ত্রিপুরা এস্টেটের ওভার সিয়ারের চাকুরী করতেন। শ্রীমণিশঙ্কর ঈশ্বর পাঠশালা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং পরে ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে সার্ভে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর নৃত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। শ্রীমহারাজ বসু তাঁর নৃত্য সম্প্রদায় নিয়ে কুমিল্লা টাউন হলে নৃত্য প্রদর্শন করতে যান। সেখানে শ্রীমণিশঙ্কর নৃত্য প্রদর্শন করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। তারপরে শ্রীউদয়শঙ্কর ও শ্রীমণি বর্ধনের ছবি দেখে, তাঁদের নৃত্য দেখে ও প্রবন্ধ পড়ে নৃত্যানুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং নিজেই নিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্য শিক্ষা শুরু করেন। কলিকাতায় আসার পর তাঁর বন্ধু শ্রীশিবপ্রসাদ মুখার্জীর আনুকুল্যে তিনি একটি চাকুরী লাভ করেন। তাঁর শিল্প সাধনার প্রগতির মূলে ছিলেন তিনি। এছাড়া আরেক সহৃদয় ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য, যিনি তাঁকে পুত্রবৎ আপন গৃহে স্থান দিয়ে আদর্শ নৃত্য শিল্পী হওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তিনি হলেন রায় বাহাদুর রমনী মোহন সিং। কলিকাতায় আসার পর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় নৃত্য প্রদর্শন করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে হীরাবাই বরদেকর, অচ্ছান মহারাজ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর নৃত্যের প্রতি তাঁর গাঢ় আসক্তির উদ্ভব হল। তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নৃত্য শিক্ষায় উৎসর্গ করলেন। তিনি শ্রীকিরীট রায়, শ্রীঅতিনলাল গাংগুলী ও শ্রীভাস্কর সেন প্রভৃতি নৃত্য শিক্ষকদের কাছে আধুনিক নৃত্য শিক্ষা করেন। এছাড়া তাঁর বিভিন্ন বিষয় নৃত্য শিক্ষকদের নাম পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

নৃত্যের বিষয়—	গুরুর নাম
১। মণিপুরী—	শ্রীব্রজবাসী সিং
	,, ধনেশ্বর সিং
	,, নবঘনশ্যাম সিং
	,, সুধীর সিং
২। কথাকলি—	,, গোপাল পিল্লাই
৩। ভরতনাট্যম্	,, মরুথাপ্পা পিল্লাই
	,, আর. এস. আনন্দম্
৪। কথক—	,, রাম সিং
	,, রাম নারায়ণ মিশ্র
	,, কৃষ্ণ মহারাজ
	,, রাম গোপালের নিকট কিছু দিন শিক্ষা করেন।

তাঁর সুযোগ্য কন্যা শ্রীমতি মায়া মুখার্জী (চক্রবর্ত্তী) বর্ত্তমানে নৃত্যে খুব সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনিয়র ডিপ্লোমা' গ্রহণ করেছেন। তাঁর দুই ভ্রাতার মধ্যে শ্রীগোবিন্দ লাল চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃত্যে সিনিয়র ডিপ্লোমা পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি টাটানগর রবীন্দ্র পরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত টাটা, জামসেদপুর স্কুলে নৃত্য শিক্ষক রূপে নিযুক্ত। অপর ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ লাল চক্রবর্ত্তীও কলিকাতায় কয়েকটি সংগীত বিদ্যালয়ের নৃত্য শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তাঁর কাছ থেকে নৃত্য শিক্ষা লাভ করে তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি বহু বিদ্যালয়ে নৃত্য সেবায় নিযুক্ত এবং আন্তর্মহাবিদ্যালয় (Inter Collegiate Competition) প্রতিযোগিতার ও বহু অপর প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে বিবেচিত হ'য়েছেন।

গুরু আমূবী সিংহ

মণিপুরী নৃত্য-গুরুদের মধ্যে গুরু আমূবী সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ১৮৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি মণিপুরের বাহিরে অতিবাহিত করেন। উদয়শঙ্করের আলমোড়ায় বহুদিন নৃত্য শিক্ষা দেন। সঙ্গীত-নাটক একাডেমির পুরস্কার ১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত হন। ভারত সরকার কর্ত্তৃক ১৯৫৯ সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। জহরলাল নেহরু মণিপুরী ড্যান্স একাডেমীতে তিনি জ্যেষ্ঠগুরুর সম্মানীয় পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৯ সালে এই মহান শিল্পীর দেহবসান হয়।

গুরু আতম্বা সিংহ

মণিপুরের নৃত্যজগতে আপন বৈশিষ্ট্যময় অবদানের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যরাস বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। নৃত্য প্রবন্ধের নানা রচনায় তাঁর প্রতিভার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শান্তি-নিকেতন থেকে 'স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৫৮ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর মণিপুরী ড্যান্স একাডেমীতে গুরুর পদে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। মণিপুরী ষ্টেট কলা একাডেমী হ'তে ১৯৫৯ সালে "ফেলোশীপের" (Fellow-ship) সম্মান পান। ১৯৫৯ সালে তিনি পরলোকে গমন করেন।

নৃত্যের রচনা ও বিবিধ

বিশ্বামিত্র ও মেনকা

একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র কঠিন তপস্যা আরম্ভ করায় দেবরাজ ইন্দ্র ভাবিলেন যে তাঁহার সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যেই হয়তো মহর্ষির এই তপস্যা এবং শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এই বুঝি সিংহাসন চলিয়া যায়। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার সভার অপ্সরাগণের রূপলাবণ্য ও কলা নিপুণতাকে কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন।

অতঃপর অপ্সরাশ্রেষ্ঠা মেনকাকে মর্ত্যে পাঠাইলেন—কারণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র, যিনি যুগপৎ ক্ষত্রঃতেজ এবং ব্রহ্মতেজের অধিকারী, তাঁহার তপোভঙ্গ করা অতি সহজ কাজ নহে।

মেনকার আগমনে সমগ্র বনস্থলীতে মধুঋতু জাগিয়া উঠিল। পুষ্পগুলি দল বিকশিত করিয়া বসন্তের মৃদুমধুর মলয় পবনে সুরভি ছড়াইয়া দিল। দক্ষিণা বাতাসে ঋতুরাজেয় আগমন-বার্তা পাইয়া বিহগকুলে কলকাকলী শুরু হইয়া গেল। তখন মেনকা নিঃশব্দ প্রণামে আপনার প্রগল্‌ভতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইলেন, ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রের নিকটে এবং তাহার পরে নৃত্যে গীতে আপনার মোহিনী মায়া বিস্তার করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পরে ঋষি বিশ্বামিত্রের দেহে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইল—মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে অপরূপ মোহিনী নারীমূর্তি মহর্ষিকে মুগ্ধ করিল,—এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, কারণ অসময়ে ধ্যানভঙ্গ হইবার কারণে বিশ্বামিত্র আর সেই সাধনার ফললাভের অধিকারী হইলেন না।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

পুরাকালে একদা সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। একশত অশ্বের শেষতমটি ইন্দ্র চুরি করিয়া পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখিলেন। সগর রাজার পুত্রগণ ত্রিভুবন খুজিয়া অবশেষে কপিলমুনির আশ্রমে যজ্ঞের অশ্বটিকে পাইয়া মুনিকেই চোর সন্দেহ করিয়া নানারূপ ভর্ৎসনা ও অপমান করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিদৃষ্টিপাতে তাহাদের ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

বহুদিন অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রেরা ফিরিল না দেখিয়া সগর রাজা পৌত্র অংশুমানকে পাঠাইলেন সন্ধান করিতে। অংশুমানও খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে কপিলমুনির আশ্রমে অশ্বটিকে দেখিতে পাইয়া স্তব-স্তুতি দ্বারা মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্বটিকে মুক্ত

করিলেন এবং পিতৃব্যদের বর্তমান অবস্থা ও তাহার কারণ জানিলেন। কপিলমুনি বলিলেন, 'যদি কোনদিন গঙ্গা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আসিয়া এই ভস্মরাশিকে স্পর্শ করেন তবেই সগর পুত্রদের পুনরুজ্জীবন লাভ করা সম্ভব।

সরগ রাজা অশ্বটিকে ফেরত পাইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন বটে, কিন্তু বহু তপস্যা করিয়াও গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করাইতে পারিলেন না। সগর রাজার পরে অংশুমান এবং তাঁহার পুত্র দিলীপও চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ অযোধ্যার রাজা হইয়াই গঙ্গা অবতরণের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা তখন ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন; অতএব ভগীরথ প্রথমে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ব্রহ্মা গঙ্গাকে আপনার কমণ্ডলু হইতে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গা যখন মর্ত্ত্যে অবতরণ করিবে তখন পৃথিবী তাহার বেগধারণ করিতে পারিবেন না; একমাত্র মহাদেবই ইহাতে সক্ষম; তুমি মহাদেবকে সন্তুষ্ট কর। ভগীরথ তখন তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। মহাদেব গঙ্গার বেগকে আপনার জটায় ধারণ করিতে রাজী হইলেন।

অতপর গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জটায় ও পরে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পথ প্রদর্শন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ঐরাবত পর্যন্ত গঙ্গার স্রোতের মুখে খড়-কুটার ন্যায় ভাসিয়া গেল। এইরূপে চলিতে চলিতে গঙ্গা এক সময়ে জহ্নু মুনির আশ্রমের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাঁহার পূজার সামগ্রী ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক গণ্ডুষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করিলেন।

ভগীরথ আবার তপস্যায় বসিলেন—জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। এক সময়ে জহ্নুমুনি ভগীরথের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা মতো গঙ্গাকে মুক্তি দিতে রাজী হইলেন এবং মুখ দিয়া

উদগীরণ করিলেন গঙ্গা উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইবেন বলিয়া দক্ষিণ জানু-দেশটি চিরিয়া গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। তাই গঙ্গার আরেক নাম 'জাহ্নবী'।

ইহার পর এক সময় গঙ্গা সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং পরে পাতালে প্রবেশ করিয়া সগরপুত্রদের ভস্মরাশির উপরে পতিত হইলে সেই পূত বারি ধারার স্পর্শে সগর রাজার পুত্রগণ শাপমুক্ত হইলেন এবং দিব্যদেহ লাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলন।

ভগীরথের দ্বারা পৃথিবীতে আনীত হইয়াছিল বলিয়া গঙ্গার আর এক নাম 'ভাগীরথী';

কালীয় দমন

কালীয় একটি সর্পের নাম। এই নাগ গরুড়ের ভক্ষ্য অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করে এবং ভয়ে কালিন্দী হ্রদে আসিয়া লুকায়। সৌভরি মুনির অভিশাপে গরুড় ঐ হ্রদের জল স্পর্শ করিলেই তাহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। তাই কালীর নাগ নিশ্চিন্তে ঐ হ্রদে অবস্থান করিত। কালীয় অত্যন্ত বিষাক্ত নাগ ছিল, উহার বিষে ক্রমে ক্রমে ঐ হ্রদের সমস্ত জল বিষাক্ত হইয়া গেল।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখাদের সহিত কালিন্দী হ্রদের পার্শ্বস্থিত গোচারণ ভূমিতে খেলিতে ছিলেন। খেলিতে খেলিতে এক সময় তাঁহাদের খেলার গোলকটি হ্রদে পড়িয়া গেল। অন্য কেহ গোলকটি খুঁজিয়া আনিতে ভীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহা উদ্ধার করিতে গেলেন। হ্রদে অবতরণ করামাত্র কালীয় নাগ তাঁহার সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সুদীর্ঘ দেহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই নাগের কবল হইতে মুক্তিলাভের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া গোপপল্লীতে সংবাদ দিল। তখন সকল গোপ ও গোপীগণসহ

নন্দ এবং যশোদা তথায় ছুটিয়া আসিলেন এবং ঐরূপ দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীতিবিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া হ্রদে ঝাঁপ দিবার প্রয়াস পাইলেন। তখন বলরাম তাঁহাদিগকে বাঁধা দিলেন, কারণ একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের লীলার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

উপস্থিত সকলকে এইরূপ কাতর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্প আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন এবং অতিরুষ্ট কালীয়ের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন। কালীয়ও তাঁহাকে দংশনের চেষ্টায় ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল এবং এইরূপে এক সময়ে অতি হীনবল হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহস্র ফণাযুক্ত উন্নত মস্তক অবনত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া ফণায় ফণায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পদাঘাতে কালীযের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। কালীয় রুধির বমন করিতে লাগিল। কালীয়ের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দয়াপরবশ হইয়া কালীয় নাগকে মুক্তি দিলেন এবং এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া তাহা-দিগকে সমুদ্র গর্ভস্থ রমণক দ্বীপে গিয়া বসবাস করিতে আদেশ দিলেন এবং সে স্থানে গরুড়ের অগম্য হইবে এই আশ্বাসও দিলেন। তখন কালীয়নাগ বিবিধ উপাচারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিল এবং পুত্রকলত্রের সহিত কালিন্দী হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইল।

নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ

ওয়াজেদ আলি শাহ ছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব। 'এই' সঙ্গীতপ্রেমী নবাবের অবদানের কথা আজিকার সংগীত সাধকদের না জানাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওয়াজেদ আলির দীর্ঘ নিরলস চেষ্টায় বাংলার সংগীতের কতখানি সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই প্রয়াসের নব মূল্যায়ণ লিখিত ভাবেই প্রয়োজন। ঔরঙ্গজেবের সময়ে সংগীতের চর্চা অতি স্তিমিত গতিতে চলিলেও ওয়াজেদ আলির সময়ে ইহা পুনরায় নূতনরূপে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে। নবাব ওয়াজেদ আলী

শাহের জন্ম হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই, এবং তেত্রিশ বছরের যুবক নবাব তাঁর প্রিয় রাজ্য ও সিংহাসন হারাইয়া (বৃটিশ গভর্ণর লর্ড ডালহৌসির অন্যায় চক্রান্তে ওয়াজেদ আলীশাহ তাঁর সিংহাসন হারান ১৮৫৬ খৃঃ) ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় চলিয়া আসেন বার্ষিক বার লক্ষ টাকা মাসোহারা লইয়া। নবাব অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন এবং নিজেও উচ্চাংগের সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাই সিংহাসনচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসেন তিনি আপনার সংগীত সাধনার সুবিধার জন্য। মেটিয়াবুরুজে তিনি বাড়ী কিনিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে বৃটিশ সরকার নবাবকে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে বন্দী রাখেন ১৮৫৮ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত। ইহার পরে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সংগীত-ক্ষেত্রে উৎসর্গ করেন। ঐ সময়কাল বাংলার নব জাগণের এক উজ্জল অধ্যায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হল ওয়াজেদ আলীর অকৃপণ চেষ্টা। তাঁর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ হইতে গুণী শিল্পী কলিকাতায় তাহার সংগীতের আসর শুরু করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই পৃষ্ঠ পোষকতা বর্তমান ছিল। নবাবের অনুরোধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণী সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যশিল্পী কলিকাতায় আসেন এবং অনেকেই দীর্ঘদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া সঙ্গীত রসপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। ওয়াজেদ আলীর সঙ্গীত দরবারের সুরের কখনও বিরতি ঘটিত না। ওয়াজেদ আলীর দরবারের প্রভাবে বাংলাদেশে সঙ্গীত চর্চার প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার আসরের শিক্ষার্থীদের অনেকেই পরবর্তীকালে খ্যাতিমান হন। ওয়াজেদ আলী প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন এই সঙ্গীত আসর ও চর্চার প্রয়োজনে, যাহার আর দ্বিতীয় নজীর ভারতে দেখা যায় না। তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞকে অর্থ সাহায্য করিতেন। সমগ্র কলিকাতা ওয়াজেদ আলীর সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষকতায় নূতন প্রেরণা লাভ করে।

ওয়াজেদ আলী একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতপ্রেমী কবি ও

গীতিকার ছিলেন। তিনি প্রচুর গান ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বই তাঁহার মেটিয়া বুরুজের প্রাসাদস্থিত ছাপাখানা 'মতবাই সুলতানী' হইতে প্রকাশিত হইত। তিনি সমগ্র জীবনে প্রায় ৬৪ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন গুণী ও সমজদার লোককে এইসব গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ বা উপহার দিতেন। তাঁহার সুপরিচিত কয়েকটি গানের প্রথম কলি হইল :

১) যব ছোড় চলি লক্ষ্ণৌ নগরী, বাবুল মোরি নৈহারা ছুট যায় ৩) নীর ভরণ কৈসে যাউঁ, ৪) দোস্ত মেরা দিল সে আপন। ইহা ব্যতীত উর্দুতে তিনি 'রাধা আওর কিষিণ কী কিসসা' নামে রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী নিয়ে একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি নাট্যকলা, সঙ্গীত ও শিল্পকলা বিষয়ে সর্বসাধারণকে অনুপ্রেরণাও দিতেন। শোনা যায়, তৎকালীন প্রসিদ্ধ নৃত-গীত বহুল নাটিকা "ইন্দরসভা'র অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন" কেশররাগ' নামক রঙ্গমঞ্চে এই নাটিকার রচয়িতা ছিলেন নবাবের সভাকবি 'অমানত'। শোনা যায়, ওয়াজিদ আলীর উৎসাহ ও প্রেরণাতেই এটি রচিত হইয়াছিল। নবাব ওয়াজিদ আলী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই নাটিকাটি —ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথাই আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও তাঁহার সভার কথা যেমন আমরা পাই তেমনই শাহজাদা, হুরীদের কথাও পাই। গানেয় ভীতরে যেমন হিন্দু দেবতাদের কথা আছে ('কাহ্নাকো সমঝাত না কোই'), আবার মুসলমান শাহজাদার কথাও আছে ('কাঁহা হ্যায় পুঁইয়া শাহজাদা জানী প্যারা')। ভাষার ভিতরে উর্দু, অবধী ও ব্রজবুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

অনেকে বলেন, আমানত এই নাটিকাটি রচনার প্রেরণা পান 'রাসলীলা' হইতে এবং তথ্যের প্রমাণ স্বরূপ 'ইন্দর সভা'য় ব্যবহৃত 'রহস' শব্দটির উল্লেখ করেন এবং বলেন এই শব্দটি নাকি 'রাস' শব্দের অপভ্রংশ। ওয়াজিদ আলির রাজত্বকালে কথক নৃত্যের

ধারাটি চর্চার দ্বারা উৎকৃষ্টতা লাভ করে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করে এবং নবাবের উদার মনোভাবের দরুণ এই নৃত্য ধারায় হিন্দু ও মুসলিম দুইটি বিপরীতমুখী সংস্কৃতির মিলন সংঘটিত হয়। ওয়াজেদ আলী শাহ মারা যান ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। মেটিয়া-বুরুজের ইমামবাড়ার সমাধিগৃহে তাঁর দেহ কবরস্থ আছে।

রাস নৃত্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস নৃত্যের সৃষ্টিকর্তা বা প্রচারক। এই নৃত্য শৃঙ্গার প্রধান ভাব লাস্য নৃত্যের একটি অঙ্গ। ভরত মুণি নাট্য-শাস্ত্রে তিন প্রকার রাসের উল্লেখ করেছেন। যেমন, তালিরাস, দণ্ড রাস ও মণ্ডল রাস। হরিবংশ পুরাণে ও ভাগবত গ্রন্থে মণ্ডল রাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে হল্লীসক নামে এক নৃত্যের প্রচলন ছিল যা মণ্ডল রাসেরই একটি রূপ। উপরোক্ত রাসগুলির মধ্যে মণ্ডল রাস অধিক প্রচলিত। প্রাচীনকালে লোক নৃত্য রাস নৃত্যের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। রাস নৃত্য বৃক্ষের শাখার ন্যায় দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ইহার মূলের উৎস একই জায়গায়; শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহই এই রাস নৃত্যের বিষয় বস্তু। ব্রজবাসকেই রাসের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা হয়। বর্তমানে ব্রজ তথা মণিপুরী রাস নৃত্য ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব অবদান। বর্ত্তমানে মণিপুরে চারটি রাস বিশেষভাবে প্রচলিত যথা বসন্তরাস, মহারাস, কুঞ্জরাস, নর্ত্তন রাস।

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা

প্রাচীনকালে নৃত্য মন্দির অর্থাৎ দেবালয় ও পর্বত গুহায় হ'ত; অতএব রঙ্গমঞ্চের কোন প্রাধান্য ছিলনা। নৃত্যশিল্পী মন্দিরের প্রাঙ্গনে দেবতাদিগের সম্মুখে নৃত্য করতেন আর ভক্তদর্শক ইহাকে অর্চনা রূপে দেখতেন। যখন রাজদরবারে নৃত্যের আশ্রয় হ'ল তখন রঙ্গমঞ্চের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজমহলের বিশাল প্রাসাদের নৃত্য হ'ত এবং রাজা, রাজার সভাসদ ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা আনন্দ

উপভোগ করতেন। রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক তখনই হ'ল যখন নৃত্য লোকরঞ্জনের জন্য মন্দির তথা রাজপ্রসাদ থেকে নৃত্যের সংগে জনগণের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। আজকাল রঙ্গমঞ্চ-এর আবশ্যকতা বেড়ে গেছে। বড় বড় শহরে বিশাল রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে।

Light (প্রকাশ)

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিদ্যুতের আলো অপরিহার্য্য। নৃত্য কলায় ইহা আশীর্বাদ স্বরূপ। শিল্পীর ভাব, ভঙ্গিমা ও অভিনয় প্রভৃতির বিশেষরূপ প্রকাশ-এর জন্য আলোর প্রয়োজন। নৃত্য রঙ্গমঞ্চ-এ আলোর বিশেষ ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আলোর জন্য একজন নৃত্য শিল্পীর নৃত্য প্রদর্শন চটকদার হয়ে উঠে। রঙ্গমঞ্চে যখন সপ্ত রঙের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে তখন স্বর্গীয় দৃশ্য সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ভরতনাট্যম্ নৃত্য কথক নৃত্যের চেয়ে আলোর অধিক প্রয়োজন। নৃত্যনাট্য-এ আলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। আলোক সম্পাত নৃত্যের সৌন্দর্য্য বর্ধিত করে এবং শিল্পীর অঙ্গের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যগুলি সম্যক-দৃষ্টিগোচর করে।

একজন কৃতি নৃত্য শিল্পী হতে গেলে কি কি গুণ থাকার দরকার ?

একজন কৃতি নৃত্য শিল্পী হতে গেলে নিয়মিত নৃত্যাভাস করা খুবই প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, 'Practice makes a man perfect।" এই উক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এইটাই বোঝা যায় যে, একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পীর গীত বাদ্য ও নৃত্য এই ত্রিবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে দখল থাকা প্রয়োজন। কেননা ভারতীয় নৃত্যে ঐ ত্রিবিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। কথক নৃত্য শিল্পে গীত, ঠুম্‌রী ও দাদরা গানের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। ভাব প্রদর্শন ভারতীয় নৃত্যের এক অপরিহার্য্য উপাদান। ভারতীয় নৃত্য ভাব সম্ভারে এতই সমৃদ্ধ যে, তার দ্বারা অনায়াসেই দর্শকের

মনকে ভাব ও রসে অভিষিক্ত করে তোলা যায়। তার প্রধান কারণ হল যে, মূকাভিনয় একটি প্রধান অঙ্গ। একটি ভাবকে প্রকাশ করতে হলে শুধু দৈহিক ভংগীমাই যথেষ্ট নয় মুখের ভাবও একটি মুখ্য উপাদান। নৃত্যের বাচকাভিনয়ের অভাব পুরণ করে গান। গানের মধ্যে রয়েছে নানা প্রকার রাগ রাগিনীর ব্যবহার যার ফলে এই রাগ মালা নৃত্যকে একটি গভীর পরিবেশের মাধ্য নিয়ে যায় এবং তার সংগে চলে ছন্দ বৈচিত্র্যের নানারকম খেলা। ভারতীয় নৃত্যে রসাভিনয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাহিত্যও সংগীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। অতএব সুদক্ষ নৃত্য শিল্পীর ক্ষেত্রে সাহিত্যের জ্ঞান একটি অত্যাবশ্যকীয়গুণ। নৃত্যে লয়কারীতার দ্বারা ছন্দ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে হলে তাল সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান দরকার সুতরাং তবলাবাদনের উপর তার দখল খুবই দরকার কারণ এই বাদনের মধ্যে সম, তালি, খালির সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নৃত্যে এমন অনেক বুলি আছে যা তবলায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কাজেই তার পরিপুরক অন্য বোল তবলার বাজানো হয়ে থাকে। এই কারণে নৃত্য শিল্পীকে তবলার বাণী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাহলে একজন সুপটু নৃত্য শিল্পী যে কোন তবলা বাদকের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বর্ত্তমান কালে বিরজু মহারাজ চৌবে মহারাজ ও রামগোপাল সকলেই নৃত্যশিল্পে ও তবলা বাদনে পটু কারণ নৃত্যেশাস্ত্র ও ক্রিয়াত্মক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অতএব একজন কৃতি নৃত্য শিল্পীর পক্ষে—

(১) নিয়মিত নৃত্যাভ্যাস, (২) গীত ও বাদ্যের দখল

(৩) ছন্দ বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাল ও লয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান, (তবলা বাদনের দক্ষতা) (৪) ভাব ও রস সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান

(৫) শাস্ত্র বা সংগীত সাহিত্য এবং ক্রিয়াত্মক বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান

(৬) মুদ্রার প্রয়োগ গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক।

এক নজরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যের প্রভেদ

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূর্য্যোদয় হওয়ার সংগে সংগে মানুষ তার বিকাশমান বুদ্ধি, চিন্তা ও উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করে আস্বাদন করেছিল বিধাতার বিচিত্রময় সৃষ্টির অন্যতম সৃষ্টি দোলায়িত ছন্দের লীলায়িত রূপকে। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই ছন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দৃষ্টি ভংগিতে একটি দেশের সাংগিতিক নিয়মাবলী সেই দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বর্ত্তমানে সংগীত জ্ঞানী পণ্ডিত বর্গ পৃথিবীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—একটি প্রাচ্য ও অপরটি পাশ্চাত্য। এই দুই ভাগের নৃত্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। প্রাচ্য দেশগুলিতে পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা উপনিবেশ স্থাপন করায় উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ভাবের আদান প্রদান হয়েছে। ফলে তাদের নৃত্য পদ্ধতি আমাদের প্রাচ্যদেশের মানুষরা দেখেছিল এবং তখনই উভয় পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

(১) প্রাচ্য দেশের মানুষরা চিরদিনই আধ্যাত্ম্য ভাবাপন্ন। কাজেই প্রাচ্য দেশের নৃত্যশৈলী জগদীশ্বরের রূপ, গুণগান ও তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা পার্থিবতাকে বড় করে দেখেছে সেই কারণে তাদের নৃত্য শৈলী তামসিকতা ভাবাপন্ন।

(২) প্রাচ্য দেশের ছন্দ বৈচিত্র্য পূর্ণ। সেই ছন্দ নৃত্যে বাদ্যে গীতে বিভিন্ন লয়কারীতার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে জন চিত্তরঞ্জন করে, অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশে ছন্দের লয় অল্প সংখ্যক মাত্রায় সীমিত প্রাচ্যের মত এতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়।

(৩) প্রাচ্য দেশের নৃত্যকলায় বিভিন্ন মুদ্রার প্রদর্শনের মাধ্যমে বহু রকমের ভাবধারাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য

প্রাচ্য দেশীয় নৃত্যে ছন্দিত অংগভংগিমার মধ্যে দিয়ে বহুল মুদ্রা প্রদর্শনকে বলা যেতে পারে এক ধরণের সুষ্ঠু সুললিত নির্ব্বাক অভিনয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় নৃত্যের মধ্যে এত মুদ্রা প্রদর্শনের প্রচলন নেই। এই নৃত্য মানুষের মনে এক সাময়িক চিত্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ক্ষণিকের আনন্দ দেয়।

(৪) প্রাচ্য দেশীয় নৃত্য শৈলীতে মুদ্রা বৈচিত্রের দরুণ অনেক ভাব ও রসের বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয়। যার ফলে এই নৃত্য কলা শুধু উপভোগ্য নয়। মনের মধ্যে পরমানন্দের সঞ্চার করে আবার পাশ্চাত্য দেশের ভাব ও রস শুধু এক ক্ষণস্থায়ী চিত্ত চাঞ্চল্যকর আনন্দের সঞ্চার হয়। তার ফলে মানবইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে।

উত্তর ভারতীয় তালের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় তালের পার্থক্য

উত্তর ভারতীয় তাল	দক্ষিণ ভারতীয় তাল
১। জাতি হিসাবে তাল নির্ণয় করা হয় না।	১। জাতি হিসাবে তালের মাত্রা নির্ণয় করা হয়।
২। অসংখ্য তাল আছে	২। তালের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট
৩। মুখ্য তাল বলে কিছু ন্যই।	৩। সাতটি মুখ্য তাল।
৪। তালের বিভাগ গুলিকে বিভাগ নামেই বলা হয়।	৪। তালের বিভাগকে বলা হয় অঙ্গ।
৫। অসংখ্য তাল থাকলেও প্রত্যেক তালেরই বাঁধাধরা ঠেকা আছে।	৫। তাল সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হলেও কোন তালের নির্দ্দিষ্ট ঠেকা নেই।
৬। খালি বা ফাঁকের ব্যবহার দেখা যায়। খালির বিভাগের প্রথম মাত্রার উপরই এই ফাঁক দেখানো হয়।	৬। খালি বা ফাঁক নেই. আছে বিসর্জিতম কোন বিভাগের প্রথম মাত্রার উপরে কখনো এই বিসর্জিতম্ হয় না।
৭। এই তাল পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল।	৭। এই তাল পদ্ধতি জটিল।

নৃত্য শিল্পীর গুণাগুণ

গুণ :—যে কোন নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর সুন্দর হওয়াই প্রধান গুণ অর্থাৎ শিল্পীর রূপ ও লাবণ্য চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার। কারণ বিভিন্ন দর্শকের মধ্যে নৃত্যবিষয়ক জ্ঞানের এবং রুচিবোধের তারতম্য থাকিতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্মগত। কথায় বলে, "পহলে দর্শনডালি পিছে গুণ বিচারি"। দর্শককে আকর্ষণ করিতে এবং নৃত্যের রস উপভোগ করিতে সহায়তা করে শিল্পীর রূপ। 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'—দর্শক মন জয় করিবার প্রধান আয়ুধ—সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, কমনীয়তা।

এই সৌন্দর্য্যকে আর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রয়োজন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব। কলাকারের ব্যক্তিত্ব এমন এক বস্তু যাহা কলাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে আবশ্যক। হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরণের দ্বারা, মননশীলতার দ্বারাই শিল্পীর এইরূপ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এই ব্যাক্তিত্ব নৃত্যশিল্পীর লাবণ্য এবং কলাকুশলতাকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করে।

মাদকদ্রব্য সেবন নর্ত্তক-নর্ত্তকীর পক্ষে একান্ত অনুচিত, কারণ ইহা সাময়িক ভাবে দেহকে ক্লান্তিহীন করিলেও, ইহার উত্তেজক পদার্থসমূহ শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিয়মিতভাবে মাদকদ্রব্য সেবন করিলে শরীর অতি শাঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। কাজেই বিষময় ফলের কথা স্মরণ রাখিয়া ঐ সকল দ্রব্য সেবন করা হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়। মাদক গ্রহণের তাৎক্ষণিক কুফলও সকল শিল্পীর পক্ষেই দুঃখ ও লজ্জাজনক এবং সেই কারণেই অনভিপ্রেত। মাদক দ্রব্য মনকে উত্তেজিত করে যাহার ফলে শিল্পীর মানসিক একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় প্রদর্শনীর সর্বত্র সম্মান রক্ষিত না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইহার ফলে শিল্পী আপনার মানসিক তৃপ্তি ও সুনাম হারান এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। ইহা শিল্পের প্রতি শিল্পীর অবিচার ও অবমাননা।

বিনয়, শিল্পীর চরিত্রে একটি প্রত্যাশিত গুন , যাহা দ্বারা শিল্পী সর্বজনপ্রিয় হইতে পারেন। 'বিদ্যা দদাদি বিনয়ং'—এই মুনি বাক্যটি স্মরণে রাখিয়া নৃত্যবিদ্যা যিনি শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার বিনয়ী হওয়া আশুকর্ত্তব্য। নম্রস্বভাব, প্রসন্নমুখ এবং উদার ইত্যাদি বিশেষণ যে শিল্পীর সম্পর্কে প্রযোজ্য তিনি দর্শকমনহারী।

নৃত্যশিল্পীর ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী হওয়া একান্ত দরকার। শিল্পীকে প্রত্যহ প্রয়োজনীয় অনুশীলনের দ্বারা নৃত্যের প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ অঙ্গভঙ্গী, হস্তসঞ্চালন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী একান্ত নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকটি নৃত্য উত্তমরূপে আয়ত্বকরা কলাকারের অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য। দৃঢ়তা, রেখা ও ভ্রমরীর অভ্যাস থাকা দরকার। নৃত্য কিভাবে সুরু বা সমাপ্ত করিতে হইবে তাহার জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। তীক্ষ্ণ নেত্র, শ্রুতিমধুর স্বর ও সুষ্ঠ উচ্চারণ (বোল বলিবার জন্য) প্রয়োজন। অধিকক্ষণ নৃত্য করিবার এবং প্রয়োজনবোধে অবস্থানুযায়ী আপনার কর্ত্তব্য নিরূপনের ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। নৃত্যকলার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা অবশ্য প্রয়োজন। সর্বোপরি প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। নৃত্যশিল্পীর সাফল্যের মূলে থাকে উল্লিখিত গুণাবলী। ইহা ছাড়া আর একটি কথা বলিবার থাকে—কোন নৃত্য প্রতিভাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আপনার কলা-কুশলতার মানকে উন্নত করা যায়, যদিও এই পথে প্রতিভাবান হওয়া যায় না। কারণ প্রতিভা মূলতঃ জন্মগত ; প্রতিভাবানদের রুচি ও পরিমিতি বোধ এবং নিজস্বতা লক্ষণীয়।

অগুণ : উপরোক্ত গুণগুলির ব্যতিক্রম হইলেই, সেইগুলি অবগুণের পর্য্যায়ে পড়ে। নৃত্যশিল্পীর খুব ছোট চোখ, কেশের বিরলতা, পুরু ওষ্ঠাধর শরীরের অত্যাধিক স্থূলতা বা শীর্ণতা, উচ্চতার আধিক্য বা হ্রস্বতা ইত্যাদি অবগুণ শিল্পীর সাফল্যের পরিপন্থী। রুক্ষ কণ্ঠস্বরও দর্শকের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। দর্শকের চিত্ত

আকর্ষণ করিতে না পারা শিল্পীজীবনের ব্যর্থতা। অবশ্য উপরোক্ত দোষগুলি প্রকৃতি-প্রদত্ত; উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। তাই উপরোক্ত দোষের অধিকারী ও অধিকারিণীগণের উচিত নৃত্যশিক্ষা না করিয়া অন্য কোন কলাবিভাগে পারদর্শী হওয়া যাহাতে জীবনে সফলতা লাভ করা যাইবে।

নৃত্যে ব্যুহক্রিয়ার মাহাত্ম্য ঃ

পুরাকালে এই ব্যুহক্রিয়া যুদ্ধে ব্যবহৃত হ'তো। অভিমন্যু চক্রব্যুহ প্রবেশ করে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন কারণ ব্যুহ ভেদ করে প্রবেশ করা রীতি তিনি জানতেন কিন্তু বার হয়ে আসার প্রণালী তার জানা ছিল না। মিলিত নৃত্যে ব্যুহক্রিয়া যত নিপুন হবে নৃত্য তত সুন্দর হবে। সুতরাং নৃত্য শিল্পীকে ব্যুহ ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই ব্যুহক্রিয়াকে ইংরাজীতে Choreography বলা হয়।

তবলা সংগতের গুরুত্ব

সকল সংগীত শিক্ষার্থীর তবলা বাজনা জানা দরকার। যে কোন সংগীত বিদ্যার কার্য্যক্রম তালবদ্ধ হয়। নৃত্যে তো তালের প্রয়োজন হয়ে থাকেই। আধুনিক কালে গীত, বাদ্য ও নৃত্যে সংগতের জন্য তবলার প্রয়োগ হয়। নৃত্যের সংগে তবলার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে।

কুতপ্ (Orchestra) বা বাদ্যবৃন্দ—আধুনিক নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ হলে তা শ্রুতিমধুর ও উপভোগ্য হয়। নতুন নতুন বিদেশী বাদ্যের প্রয়োগ আধুনিক নৃত্যে হয়ে থাকে, এমন কি পার্শ্বগীতও নৃত্যের সংগে পরিবেশিত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে বাদ্যবৃন্দ এবং পার্শ্বগীতের জন্য নৃত্যের সজীবতা আজও রক্ষিত হয়ে এসেছে।

নৃত্যে তালের গুরুত্ব

নৃত্যে তালের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় এতে তার স্থান অত্যন্ত মহত্ব পূর্ণ বটে। সকল নৃত্যই তালের ওপর প্রতিষ্ঠীত। সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং
যতোস্তালে প্রতিষ্ঠীতম্"

অতএব নৃত্য, গীত এবং বাদ্য এই ত্রিবিদ্যাই তালের ওপর প্রতিষ্ঠীত।

অর্থাৎ তালই এদের শোভার্বধন করেছে। তাল নৃত্যের চলন ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। সুতরাং তাল অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

লয়

গীত, বাদ্য ও নৃত্যের ক্রিয়ার সমান গতি বা চালকে লয় বলে। এই জন্য লয় গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

চমৎকার নৃত্য

অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়া দুই হাত মিলিত করে নৃত্য করিলে তা'কে চমৎকার নৃত্য বলে।

লক্ষ্ণৌ ও জয়পুরী ঘরানার পার্থক্য।

লক্ষ্ণৌ ঘরানা কথক নৃত্যে ভাবের প্রাধান্য বেশী, তাল ও লয়ের কাজ যে নাই তাহাও বলা চলে না। লক্ষ্ণৌর শিল্পীরা বলেন নৃত্যে ভাব ও রসের প্রাধান্য থাকা উচিত। নতুবা নৃত্য প্রাণহীন হয়ে যায়। জয়পুর ঘরানা কথক নৃত্যে পায়ের কাজ খুব বেশী এবং অঙ্গ-ভঙ্গী কম। ইহাতে তাল-লয়ের প্রাধান্য বেশী অর্থাৎ লয়কারীর দিকে ইহাদের লক্ষ্য বেশী এবং সেগুলি শুধু দুটি পায়ের সাহায্যেই প্রদর্শিত হয়। ভাবের এক প্রকার অভাব বলা চলে। এই নৃত্যে তাল ও লয়ের কাজ কঠিন বর্তমানে কিছু কিছু গৎ-ভাও এই নৃত্যে দেখা যায়।

নৃত্য ও সাহিত্য

পৃথিবীতে যত কলাবিষয়ক শিক্ষনীয় বস্তু রয়েছে তাদের প্রত্যেকের সংগেই সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ইংরাজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে যে "Literature is the true mirror of life," অর্থাৎ সাহিত্য হল সত্যিকরের জীবনের দর্পণ। তার কারণ হ'ল, সাহিত্য কথাটি ভেঙে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, সহি+তত্ত্ব অর্থাৎ যে তত্ত্ব মানুষের মনের সংগে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। অতএব মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির তাগিদে মানুষ জীবন ভাণ্ডারে যেখানে যে যে সুন্দর বিষয় বস্তু সংগ্রহ করেছে তার ভাষায় প্রকাশকেই আমরা সাহিত্য বলে অভিহিত করেছি।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে নৃত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কোথায়? তাহলে আমাদের দেখতে হবে নৃত্য কাকে বলে। নৃত্য কথাটি এসেছে "নৃতি" ধাতু থেকে অর্থাৎ যার অর্থ হল অঙ্গ সঞ্চালন। সুতরাং যে অঙ্গ সঞ্চালন বা গাত্র বিক্ষেপন সুনিয়ন্ত্রিত, সুদৃশ্য ও ছন্দময় তাকেই বলেছি আমরা নৃত্য।

মানুষের মন আনন্দ পিয়াসী। তাই সে মনেব তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খুঁজে ফেরে আনন্দ কে। এটা হল তার সহজাত প্রবৃত্তি। তাই প্রকৃতিব বুকে যেখানে যখনই জেগেছে ছন্দের স্পন্দন তখনই সে ছুটে গেছে সেখানে। বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত বৃক্ষ পত্র সকল, প্রবহমান তটিনীর কলোকল্লোল প্রভৃতি সব কিছুর ছন্দিত দোলা তার মনে এনেছে সংবেদনশীল প্রতিঘাত (Sympathetic Vibration) তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ছন্দিত দোলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুলে উঠেছে সমানে সমানে।

এই দিকে দেখতে গেলে ভাব ও রস সাহিত্যের মত নৃত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাব ও রসের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর। একে অন্যের সহায়তা ব্যতিরকে প্রকাশ হয় না। তাই যখন যে পরিবেশে মানুষের ভাবোদয় ঘটেছে তখনই সেখানে

বিচিত্র ভঙ্গিমার অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে ফুটেছে কত রস বৈচিত্র্য। কাজেই যে বিষয় বস্তু মানুষের জীবনোত্থানে তার মনের সঙ্গে লতার মত জড়িয়ে আছে তার ক্রিয়াত্মক বা ভাষাগত প্রকাশ তো নিশ্চয় থাকবে। সুতরাং নৃত্য ও সাহিত্য হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক অপরিহার্য্য বিষয়বস্তু। ভারতীয় নৃত্যে রসাভিনয়ের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী নৃত্যের তুলনামূলক আলোচনা

ভরতনাট্যম নৃত্যে কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সময় যে চতুরঙ্গের রীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহা অন্য কোন নৃত্যে বিরল। মূলরস শৃঙ্গার এবং নায়িকা প্রধান নৃত্য।

কথাকলি নৃত্যে অঙ্গহারাভিনয় প্রাধান্য দিয়াছে। নারী চরিত্র গুলি পুরুষেরা অভিনয় করিয়া থাকেন। ইহা নৃত্যনাট্য প্রধান বলিয়া নবরসের প্রায় সবগুলিই প্রদর্শিত হয়। বীর রস প্রধান।

কথক নৃত্যে দেখা যায় মূলত তালাশ্রয়ী এবং দ্বিতীয়ত শিল্পী এই নৃত্যে বাঁধাধরা ছক অতিক্রম করে নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রায় অবাধ স্বাধীনতা আছে।

মণিপুরী নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শৃঙ্গার রসের সহিত ভক্তিরসের মিশ্রণ আছে। ভরতনাট্যমের ন্যায় উচ্ছল ও অভিনয় প্রধান নয়।

ভরতণাট্যম ও কথাকলি নৃত্ত ও নৃত্য অংশই প্রধান। কথক নৃত্তাংশই প্রধান এবং মণিপুরী নৃত্য অংশই প্রধান।

লয়কারী

গত (গৎ) বাজাইবার সময় কোন না কোন লয় থাকে, যাহা ঠায় বা বিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রুত লয়ে হয়। এই লয়গুলির মধ্যে অন্যলয় অর্থাৎ তিন মাত্রাকে বা তিন মাত্রার বাণীকে দুই মাত্রার মধ্যে বলা হয় বা দেখানো হয়। ইহাকে "লয়কারী" বলা হয়।

কেহ কেহ বলেন ঠায় লয়কে, দ্বিগুণ ও চৌগুণ করে দেখানোকে 'লয়কারী' বলে। অতএব লয়ের ছন্দ-বৈচিত্র্যকে বলা হয় লয়কারী।

লয়কারী করার সূত্র (Formula) নিম্নরূপ—ত্রিতালকে তিনগুণে পরিণত করিতে হ'লে মাত্রা সমষ্টি ÷ যতগুণ = ভাগফল এবং মাত্রা — (বিয়োগ) ভাগফল = লয়কারী আরম্ভের আগের মাত্রা। যেমন, ত্রিতাল, ইহার মাত্রা = ১৬, উপরোক্ত সূত্র অনুসারে লয়কারীর আরম্ভের স্থান (১৬ ÷ ৩ = ৫$\frac{১}{৩}$ মাত্রা। ১৬ থেকে ৫$\frac{১}{৩}$ বিয়োগ করে পাওয়া যায় $১৬ - \frac{১৬}{৩} = \frac{৪৮ - ১৬}{৩}$) = ১০$\frac{২}{৩}$ মাত্রার পর থেকে তিন-গুণ আরম্ভ করিতে হইবে।

	১১		১২		১৩	১৪
যথাঃ-	- -	ধা	ধিনধিনধা	|	ধাধিনধিন	ধানাতিন

১৫	১৬		
তিনতাধা	ধিনধিনধা	|	ধা
			×

কুঁয়াড় লয়—৪ মাত্রায় ৫ মাত্রা বলা বা লেখাকে কুঁয়ার লয় বলে। যেমন, ১ঽঽঽ২ ঽঽঽ৩ঽ ঽঽ৪ঽঽ ঽ৫ঽঽঽ

বিঁয়াড়ী লয়—চার মাত্রায় সাত মাত্রার বোল বলাকে বিঁয়াড়ী লয় বলে।

অঙ্কের দ্বারা বিঁয়াড়ী লয় নিম্নে দেওয়া হল—

১ঽঽঽ২ঽঽ ঽ৩ঽঽঽ৪ঽ ঽঽ৫ঽঽঽ৬

ঽঽঽ৭ঽঽঽ

ঝাঁপতাল দ্বারা বিঁয়াড়ী লয়—

ধী না | ধী ধী ১২ধীঽঽঽনা | ঽঽঽধীঽঽঽ

× ২

ধীঽঽঽনাঽঽ | ঽতিঽঽঽনাঽ ঽঽধীঽঽঽধী ঽঽঽনাঽঽঽ |

৩

গ্রন্থপঞ্জী

	পুস্তকের নাম	লেখক
১।	অভিনয় দর্পণ	শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী
২।	সঙ্গীত রত্নাকর	শার্ঙ্গদেব
৩।	নাট্যশাস্ত্র	" অভিনব গুপ্ত
৪।	সঙ্গীত ও সাধনা	" সুধীর কুমার দত্ত
৫।	জিজ্ঞাসা	" রামপ্রসাদ রায়
৬।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (১ম খণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব	"শ্রী রাধা গোবিন্দ নাথ
৭।	কথক নৃত্য	" লক্ষী নারায়ণ গর্গ
৮।	রবীন্দ্র গীতি প্রবাহ (১ম)	" শ্রীকিরণ শশী দে ও রমেন্দ্র চৌধুরী
৯।	নৃত্য ভারতী (১ম)	" শ্রীআচার্য সুধাকর
১০।	কথক নৃত্য	" শ্রীপ্রকাশ নারায়ণ
১২।	চলন্তিকা	৺রাজশেখর বসু
১৩।	সমাজ বিদ্যা	" বিনয় ঘোষ
১৪।	A History of Indian Music	Swami Prajnananda
১৫।	মৈতৈ জগোই	শ্রী সুরচান্দ শর্মা

ভ্রমশুদ্ধি

পৃঃ	পংক্তি	ভ্রম	শুদ্ধি
১০	১৬	বসের	রসের
৪৫	৫	{(বা ৪।)	{(বা ১/৪)
৫৮	১৫	বরবারে	দরবারে
৭৮	৭	ভিকধাভিগভিগ	তিগধাতিগতিগ
৯৪	Heading	তিমতালমচা	তিনতালমচা
১০৪	১৭	মৃতাশীর্ষ	মৃগশীর্ষ
১১১	১৪	এইতাবে	এইভাবে
১১৩	৮	তিম	তিন
১:৪	২	ধিন	ধিন
১১৫	৮	১	৭
১১৭	১০	মাত্রা ৩২,২৩	১২,১৩ হবে
১২০	১২	অনাগত গ্রহ	১২-এর নীচে হবে
১২১	১১	গতি	গতির